দ্য পার্ল

জন স্টাইনবেক

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

দ্য পার্ল

জন স্টাইনবেক

অনুবাদ
খন্দকার মজহারুল করিম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৯৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪১৪ জানুয়ারি ২০০৮

দ্বিতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0296-1

উৎসর্গ

খন্দকার স্বনন শাহরিয়ার
খন্দকার অমিয় শাহরিয়ার
পরবর্তী প্রজন্মের লেখকদের হাতে—
বাবা

দ্য পার্ল জন স্টাইনবেকের বিখ্যাত একটি উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কিনো এক সাধারণ গরিব মানুষ—সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তো তুলে এনে ঝানু ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে সামান্য দামে।

কিনো এক অসাধারণ পুরুষ—বউ জুয়ানার চোখে সে ঈশ্বরের মতো; সমুদ্রের উথালপাতাল তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গ করে, দৈত্যের শক্তিতে আগলে রাখে সংসার। তাদের সেই নিরালা শান্ত জীবন একদিন চরম অশান্ত হয়ে ওঠে এক মহামূল্য মুক্তো ঘিরে। সচ্ছল জীবনের স্বপ্ন ভিড় করে আসে, আর আসে দ্বন্দ্ব-দ্বিধা-সংশয়-হিংসা-লোভ—নৃশংস হত্যাকাণ্ড —জীবন মূল্যহীন হয়ে ওঠে সামান্য মুক্তোর জন্য।

এ সেই চিরদিনের রূপকথা—দিনে দিনে, দেশে দেশে যা শুধু চেহারা বদলায়, চরিত্র বদলায় না।

অনুবন্ধ

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন ঔপন্যাসিক জন আর্নেস্ট স্টাইনবেকের জন্ম ১৯০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি, ক্যালিফোর্নিয়ার স্যালিনাসে। ছেলেবেলায় পড়াশুনা করেন নিজ শহরের হাইস্কুলে। ১৯১৮ সালে গ্র্যাজুয়েশনের পর ভর্তি হন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ছাত্র ছিলেন তিনি। প্রথম বিয়ে ১৯৩০ সালে, ক্যারোল হেনিং-এর সঙ্গে। ১৯৪৩ সালে ছাড়াছাড়ির পর জুইন কনিয়ারকে বিয়ে করেন। দুই ছেলের জন্ম এই সংসারে। এ-বিয়েও তাঁর টেকেনি। ১৯৪৯ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ১৯৫০ সালে বিয়ে হয় ইলেনি স্কটের সঙ্গে।

জীবিকার জন্য অনেকবার পেশা বদলেছেন জন স্টাইনবেক। পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন। নবিশ চিত্রকর হিসেবে ছবি এঁকেছেন কিছুদিন। অট্টালিকা তৈরির জোগালের কাজ করেছেন। কেমিস্ট হিসেবে চাকরি আর কেয়ারটেকারের কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এমনকি ফলবাগানে ফলও তুলেছেন একসময়। লেখালেখির অভ্যেস আগেও ছিল। তবে লেখাকে পুরোপুরি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন ১৯৩৫ সালে।

জন স্টাইনবেকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে : 'কাপ অভ্ গোল্ড', 'দ্য প্যাশ্চারস অভ্ হেভেন্', 'টু অ্যা গড আননৌন', 'টরটিলা ফ্যাট', 'ইন ডুবিয়াস ব্যাট্ল্', 'সেন্ট কেটি দ্য ভারজিন', 'অভ্ মাইস অ্যান্ড মেন', 'দ্য রেড পোনি', 'দ্য লং ভ্যালি', 'দ্য গ্রেপস অভ্ র‍্যথ', 'দ্য মুন ইজ ডাউন', 'বম্স অ্যাওয়ে', 'ক্যানারি রৌ', 'দ্য ওয়েওয়ার্ড বাস', 'দ্য পার্ল', 'অ্যা রাশান জর্নাল', 'বার্নিং ব্রাইট', 'দ্য লগ ফ্রম দ্য সী অভ্ কর্টিজ', 'ইস্ট অভ্ ঈড্ন্', 'সুইট থার্সডে', 'দ্য শর্ট রেইন অভ্ পিপিন ফোর', 'ওয়ান্স দেয়ার ওঅজ অ্যা ওঅর', 'ট্র্যাভ্ল্স্ উইথ চার্লি' প্রভৃতি।

পত্রগুচ্ছের জন্যও জন স্টাইনবেক অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর অসম্ভব সুন্দর চিঠিপত্রের দুখানা সংকলন সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। ইলেনি স্কটের সম্পাদিত বইটির নাম 'স্টাইনবেক : অ্যা লাইফ ইন লেটারস।'

জন স্টাইনবেকের লেখালেখি সম্পর্কে ওয়ারেন ফ্রেন্শ্ বলেন : জীবদ্দশায় তাঁর লেখার সমালোচকরা মাঝে মাঝে হতভম্ব হয়ে যেতেন। তাঁর প্রত্যেক নতুন উপন্যাসই ছিল বিষয় আর আঙ্গিকের দিক থেকে নতুন নতুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবাই আরও অবাক। তাঁর শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা ম্লান হয়ে এসেছে। পরে অবশ্য বৃহত্তর

পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিচার করার সুযোগ পাওয়া গেল। যাকে হঠাৎ প্রতিভার হানি মনে হয়েছিল, দেখা গেল, তা আসলে স্টাইনবেকের সৃষ্টিশীলতার নতুন মোড়। তখন ছিল আধুনিকতাবাদের অন্তিম সময়। সবাই স্বীকার করেছেন ওই যুগের বিশেষ পরিস্থিতির কথা। মরিস বিবি 'হোয়াট মডার্নিজম ওঅজ' বইয়ে এই উপলব্ধির যে-বিবরণ দিয়েছিলেন তার সম্প্রসারণ ঘটালেন ফিলিপ স্টেভিকস্। স্টেভিকস্ বললেন : 'আধুনিকতা ধারণার সংজ্ঞা লুকিয়ে আছে এর গূঢ় শ্লেষ আর দ্ব্যর্থকতা, বাচনিক ঋজুতা আর বাহুল্যহীনতা, সর্বোপরি এর স্বল্পভাষিতার মধ্যে।' স্টাইনবেকের মূল সুর ছিল ওই আধুনিকতা।

১৯৩০-এর দশকে—যখন জন স্টাইনবেকের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, রচনাশৈলীও বলিষ্ঠতার শীর্ষে উঠেছে—সমালোচকগণ এক নতুন স্বাদের শ্লেষ খুঁজে পেলেন। স্টাইনবেকের প্রথম উপন্যাস 'কাপ অভ্ গোল্ড'-এর আলোচনায় স্যার হেনরি মরগ্যান বললেন : 'সভ্যতা একটি মানবসত্তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে নানান সত্তার জন্ম দেবে। যে এই বহুধাবিভক্তির সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না, সে মরেছে।' প্রথম গ্রন্থের মাধ্যমে জন স্টাইনবেকের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা গেল, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে তাঁর পরের সব বইগুলো একেবারে আলাদা। প্রথম বইয়ের কাহিনী লক্ষ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। এটি আসলে ছিল একটি ঐতিহাসিক পোশাকি কাহিনীর ঝলমলে রচনা। ক্যারিবিয়ান সাগরের এক জলদস্যু এ-কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু, যে কিনা এক কিংবদন্তির নারীর জন্য সোনার শহর পানামা তছনছ করে, তারপর সেই নারীকে মুক্তিপণের বিনিময়ে তুলে দেয় তার স্বামীর হাতে। তার দস্যুদলে ছিল অনেক ক্রীতদাস। তাদের সবাইকে বিক্রি করে উঁচুপদের রাজ-অমাত্যের চাকরি গ্রহণ করে সে। ১৯২০-এর দশকে 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' সাহিত্য যে মোহমুক্তি আর পার্থিব জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ মনোভাবের দর্শন প্রচার করত, 'কাপ অভ্ গোল্ড'-ও রচিত হয়েছে সে-আদর্শে।

জন স্টাইনবেকের তৃতীয় উপন্যাসের নাম 'টু অ্যা গড আননৌন।' এখানে কাহিনী, প্রেক্ষাপট, চরিত্র, সবকিছুতেই নতুন মাত্রা, নতুন আমেজ। কল্পকাহিনীর আড়ালে আসলে সময়ের তীব্র যন্ত্রণা আর দ্বন্দ্বের ভাষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়জনের নাম জোসেফ ওয়েইন—একাধারে লালসা, শুদ্ধতার বাতিক, বন্যতা আর সর্বোচ্চ ত্যাগের অদ্ভুত প্রতীক—যে তার খরাপীড়িত উপত্যকার কল্যাণে বৃষ্টির জন্য আত্মদান করে। 'প্যাশ্চারস অভ হেভ্ন্' উপন্যাসেও জন স্টাইনবেক সেই নতুনত্ব বজায় রেখেছেন, আর তার সঙ্গে যোগ করেছেন অন্য এক দর্শন—প্রকৃতিবাদ। অবশ্য পরের কাহিনীগুলোতেও তাঁর প্রকৃতিবাদী দর্শনের পরিচয় মিলেছে।

'টরটিলা ফ্যাট'-এ জন স্টাইনবেক আবার খেলেছেন ভাঙাচোরা মানুষের চরিত্র নিয়ে। এতে আছে ড্যানি নামের এক চরিত্র—যে সম্পত্তির নেশায় তার স্বাভাবিক জীবন ত্যাগ করে চলে যায় গভীর জঙ্গলে, তারপর একদিন বুঝতে পারে, আর

কোনোদিন সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না। অসীম হতাশায় ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাবে একদিন।

ঠিক এইভাবে রাজনীতি-চেতনার প্রমাণ দেন জন স্টাইনবেক তাঁর 'ইন ডুবিয়াস ব্যাট্‌ল্' গ্রন্থে। আমেরিকানদের খুব প্রিয় এই উপন্যাসে বাস্তবধর্মিতার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে সমাজের দ্বন্দ্বমুখর শ্রেণীসমূহের কথা। 'দ্য গ্রেপস্ অব্ র‍্যথ' নামের উপন্যাসটির মতো বিতর্কিত ও সমালোচিত হয়নি এই বই, কিন্তু এর পাঠকসংখ্যা কম নয়। 'দ্য গ্রেপস্ অব্ র‍্যথ' আপাতদৃষ্টে ওকলাহোমার একটি পরিবারের চরম দুর্দশা আর জীবনসংগ্রামের কাহিনী। কিন্তু এর মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে গোটা মার্কিনজাতির সূচনা আর উত্থানের ইতিহাস—যা বহুবিখ্যাত টিভি সিরিয়াল 'ওয়ালটনস্'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি পরিবারের আনন্দ-বেদনা এভাবে একটি জাতির আনন্দ-বেদনার প্রতীক হয়ে ওঠে, এভাবে পৃথিবীর নানান উন্নতিশীল জাতির আপন কাহিনীতে পরিণত হয় জন স্টাইনবেকের উপন্যাস।

'দ্য পার্ল' উপন্যাসেও আমরা পাব অন্য এক স্টাইনবেকের অন্তরঙ্গ পরিচয়। খুব সামান্য একটি কাহিনী পাঠকের মনে এত প্রবল দোলা দিতে পারে, এ-বই পড়ার আগে তা ভাবা যায় না। এ-উপন্যাসের মূল চরিত্র এক জেলে, তার বউ আর একমাত্র সন্তান। কিন্তু কাহিনীবিন্যাসের মধ্যে নিজেকে এক অসামান্য চরিত্রে রূপান্তরিত করতে পেরেছে একটি জড়পদার্থ—একটি মুক্তা। এখানেও অনন্য দক্ষতার সঙ্গে, ভালোবাসার সঙ্গে মানবহৃদয়ের প্রতিকৃতি এঁকেছেন স্টাইনবেক।

এই কাহিনীতে কিনো জেলের মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন সারা পৃথিবীর রিক্ত, নিঃস্ব মানুষের স্বপ্ন আর সংগ্রামের ছবি। কিনোর মুখে বেশি কথা দেননি লেখক; কিন্তু অফুরন্ত স্বপ্নের আনাগোনা দেখিয়েছেন। তার চেয়ে বেশি শুনিয়েছেন গান। কিনোর পূর্বপুরুষরা বিখ্যাত ছিল গান বাঁধার জন্য। আমাদের কবিয়ালদের কথাই মনে পড়ে যায়। কিনো গান-বাঁধতে পারে না, কিন্তু তার সমস্ত চৈতন্যে সংগীত খেলা করে। স্বপ্নে-স্বপ্নভঙ্গে, আশায়-নিরাশায়, সাহসে-শঙ্কায়, প্রেমে-ক্রোধে সুর তার অস্তিত্ব গ্রাস করে উঠে আসে। কিনো'র পৃথিবী যেন একটি বীণা। রাতের অন্ধকারে সিঁধেল চোর একটি তারে ঝংকার তোলে; ঠিক যেমন করে অন্য একটি সুরে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে দেয় মুক্তো বিক্রি করতে না-পারার ব্যর্থতা। এই সুরটুকুর জন্য কিনো অনেক মানুষের মধ্যে অনন্য; কিনো'র কাহিনী অজস্র কাহিনীর মতো হয়েও তুলনাহীন।

জন স্টাইনবেক কিনো'র শৌর্য, জুয়ানা'র প্রেম আর তাদের চারপাশের মানুষদের লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা আর হিংস্রতার যে-ছবি এঁকেছেন তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'দ্য পার্ল'-এ, তার প্রতি আঁচড়ে চেষ্টা করেছেন অটল পাহাড়ের মতো নির্বিকার আর মোহমুক্ত থাকতে। কিন্তু তাতে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ওপর এতটুকু অবিচারের প্রমাণ মেলেনি। ভাষ্যকারের নৈরপেক্ষ্য কাহিনীকে আবেগহীন রিপোর্টে পরিণত করেনি। তার বদলে কাহিনীর মধ্যকার

চরিত্র আর নিসর্গের নানান সম্পর্কের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া পেয়েছে প্রবল শক্তি আর গতি। অবাধে সাঁতার কেটেছে চেতনার মাছগুলো।

এইভাবে শেষপর্যন্ত কয়োটিটো হয়ে উঠেছে পৃথিবীজোড়া পাঠকের শিশু। নারীমাত্রেই একান্ত সান্নিধ্য পেয়েছে কিনো-ঐশ্বর্যের; সারা পৃথিবীর পুরুষ জুয়ানা'র মধ্যে দেখেছে চিরচেনা কন্যা-জায়া-জননীকে। একটি শিশুর মৃত্যু, একটি মুক্তাকে ঘিরে গড়ে-ওঠা স্বপ্ন কিংবা তার হারিয়ে যাওয়ার বেদনা—যা অবিরাম ভার হয়ে ওঠে পাঠকের বুকে, তার সবই হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সব মানুষের সম্পদ। মানুষ অনন্ত স্বপ্নের মতো ওদের আশাই বুকে লালন করতে করতে কখন যেন অশ্রুধারায় ভিজে যায়, কখন নিজের মনে গেয়ে ওঠে : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই', সে নিজেও জানে না।

ঠিক তখন হয়তো বঙ্গোপসাগরের তীরে একজন জেলে একটি বড় মাছ ধরার আনন্দে চিৎকার করে উঠছে কিনো'র মতো, কিংবা লা পাজের ধূলিধূসর পথে হেঁটে আসছে এক সন্তানহারা দম্পতি, তাদের পিছনে সূর্য, দীর্ঘ ছায়ার ভার কাঁধে নিয়ে হাঁটছে তারা... কেবলই হাঁটছে...

'আজও সেই বিখ্যাত মুক্তার কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফেরে—কীভাবে পাওয়া গিয়েছিল, আবার কিভাবে হারিয়ে গেল। এ হচ্ছে কিনো জেলে, তার বউ জুয়ানা আর তাদের বাচ্চা কয়োটিটোর গল্প—হাজারবার শুনতে শুনতে যা গেঁথে গেছে লোকের মনে। বারবার শোনা অন্যসব গল্পের বেলায় যেমন হয়, এ-কাহিনীতে তেমনই আছে ভালো আর মন্দ, সাদা আর কালো, সাধু আর শয়তান। এর মাঝামাঝি কোথাও কিছু নেই।

'এ-আখ্যানে নীতিকথা বলে যদি কিছু থাকে, হয়তো পাঠক নিজের মতো করে নিজেই তার ব্যাখ্যা করে নেবেন। হয়তো নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাবেন এর ভিতর। যাই হোক, লোকে যা বলে তা এই...'

খন্দকার মজহারুল করিম

এক

অন্ধকার ভালো করে কাটার আগেই কিনোর ঘুম ভেঙে গেল। তখনও আকাশে ঝিলমিল করছে তারা, পুবের আকাশে সবেমাত্র হালকা আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। মোরগ ডাক দিচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। শুয়োরগুলো আগেই উঠেছে; ঝোপঝাড়, ডালপালা উলটে দেখতে শুরু করেছে, কোথাও খাওয়ার কিছু পড়ে আছে কিনা। কুঁড়েঘরের বাইরে টুনা মাছের ডাঁইয়ের আশপাশে কিচিরমিচির করছে তিতির পাখির ঝাঁক।

কিনো চোখ মেলল। প্রথমে তাকাল উজ্জ্বল, চৌকা জিনিসটার দিকে—সেটা দরজা। তারপর তার দৃষ্টি গেল দোলনার দিকে। সেখানে কয়োটিটো ঘুমিয়ে আছে। সবশেষে সে মাথা ঘোরায় তার বউ জুয়ানার দিকে। মাদুরে তার পাশেই শুয়ে আছে জুয়ানা। নীল চাদরটা পড়ে আছে বুকের উপর, কিছুটা ঢেকে রেখেছে পিঠ। জুয়ানা আগেই জেগেছে। কিনো মনে করতে পারে না, কোনোদিন ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছে কি না। তার চোখ তারার মতোই জ্বলজ্বল করে ওঠে। অপলক চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। অমন করেই তাকায় সে।

কিনো কান পেতে শুনল, ভোরের মৃদু ঢেউ আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের কূলে। চমৎকার লাগছে। কিনো আবার চোখ বুজে সেই সংগীত উপভোগ করতে লাগল। ওর মনে হয়, ও একাই এ-গান শোনে। কিংবা কে জানে, হয়তো আশপাশের সব মানুষই উপভোগ করে ওই মূর্ছনা। ওর পূর্বপুরুষেরা একসময় গান-বাঁধার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাদের সব দেখা, সব শোনা, এমনকি কাজ কিংবা ভাবনাগুলোও সংগীত হয়ে উঠত। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা। সেসব গানের কিছু কিছু জানে কিনো। কিন্তু যা ছিল, তা-ই আছে। নতুন কোনো গান আর বাঁধা হয়নি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে নতুন কোনো গান মনে দানা বেঁধে ওঠে না। এই তো, এখনও কিনোর মনের গহনে সুর উঠছে। স্পষ্ট, কোমল সুর। যদি ওই সুরের সঙ্গে বাণী বসিয়ে দিতে পারত, তবে কিনো তার নাম দিতে পারত 'সংসারের গান।'

স্যাঁতসেঁতে বাতাস থেকে শরীর বাঁচানোর জন্য নাক পর্যন্ত কম্বল টেনে শুয়ে থাকে কিনো। পাশে কাপড়ের খসখসানি শুনে ফিরে তাকায়। জুয়ানা বিছানা ছেড়ে উঠছে। প্রায় নিঃশব্দে দোলনার দিকে এগিয়ে গেল সে। আদর করল কয়োটিটোকে। শিশুটি ক্ষণিকের জন্য চোখ মেলে তাকাল, আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

জুয়ানা বসল মাটির চুলোর কাছে। কয়লার ঢাকনা সরিয়ে বাতাস দিতে লাগল। কয়েক ফালি শুকনো ডালপালাও গুঁজে দিল চুলোর ভিতর। তেতে উঠছে চুলো।

কিনো-ও উঠল। কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে নিল মাথা, নাক আর কাঁধ। স্যান্ডেলে পা গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল সূর্যোদয় দেখার জন্য।

দরজার বাইরে গিয়ে উবু হয়ে বসল সে। কম্বলের কোণা টেনে দিল হাঁটু পর্যন্ত। দেখতে পেল, উঁচু আকাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ। একটা ছাগল কাছে এগিয়ে এল; ঠাণ্ডা, হলুদ চোখে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। পিছনে জুয়ানার চুলো জ্বলে উঠেছে দপ্ করে। কুঁড়েঘরের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ছুটে এসেছে আলোর ফালি। সে-আলোয় বাইরের মাটির উপর তৈরি হয়েছে কাঁপা-কাঁপা আলোর অপরূপ চতুর্ভুজ নকশা। তুমুল গর্জন তুলে কোত্থেকে যেন ছুটে এল একটা পতঙ্গ, আলোর উৎস খুঁজে বেড়াতে লাগল আত্মাহুতি দেবার জন্য। এরপর কিনোর পিছন দিক থেকে ভেসে এল সত্যিকার 'সংসারের গান'—গম-পেষাইয়ের ছন্দ। জুয়ানা সকালের নাশতার জন্য রুটি সেঁকবে।

তারপর সকাল হল বেশ তাড়াতাড়ি। প্রথমে একটা হালকা আভাস ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেটা। তারপর আলো ফুটল। সবশেষে আগুনের বিস্ফোরণের মতো সাগর ফুঁড়ে উঠল সূর্যটা। আলোর প্রাখর্য থেকে বাঁচানোর জন্য চোখ নামিয়ে নিল কিনো। বাড়ির ভিতর থেকে রুটি সেঁকার শব্দ ভেসে আসছে, আর আসছে সুবাস। মাটির উপর পিঁপড়েরা বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। চকচকে গা-ওয়ালা কালো, বড় পিঁপড়ে আর কাদামাখা শরীর নিয়ে পিলপিল করে ছুটছে ছোটগুলো। কিনো ঈশ্বরের মতো নির্বিকার চোখে তাকিয়ে দেখল খুদে পিঁপড়ে কীভাবে বড় পিঁপড়ের তৈরি চোরাবালি পার হবার জন্য মরণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি রোগা, শান্ত কুকুর এসে কিনোর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। কিনোর কাছ থেকে আদায় করল একটু মিষ্টিকথা, তারপর বিগলিত হয়ে বসে পড়ল কুণ্ডলী পাকিয়ে। লেজ গুটিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে রাখল পায়ের উপর, জিভ দিয়ে চাটতে শুরু করল। কুকুরটা কালো; চোখের উপর ভুরুর জায়গায় সোনালি-হলদে ফুটকি। সকালটা অন্যসব সকালের মতো, তবু কেমন যেন আলাদা মনে হয়; একটি নিটোল সকাল।

কিনো দোলনার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পেল। জুয়ানা ছেলেকে দোলনা থেকে তুলে নিচ্ছে; তার গা ধুইয়ে নিজের শাল দিয়ে পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে রাখছে বুকের সঙ্গে। ওদের দিকে না-তাকিয়েও এসব দেখতে পায় কিনো। জুয়ানা গুনগুন করে একটা গান গাইছে। মোটে তিনটে কলি সে-গানের আর আছে হরেক রকমের বিরতি। এ-ও বুঝি সংসার-সংগীতের অংশ। এই সবই সংগীত। কিনোর মাঝে মাঝে মনে হয়, এ-গান কখনও কখনও এমন এক স্বরগ্রামে পৌঁছে যায় যে-সুর তুলতে গিয়ে বেদনায় গলা ধরে আসে। এই সংসারই তো নিরাপত্তা, উত্তাপ! এ-ই তো জীবনের সব পাওয়া।

কিনোর বাড়ি লতাগুল্মের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার ওপারে অন্য বাড়িঘর। সবই শুকনো ডালপালার তৈরি। সেসব বাড়ি থেকেও ধোঁয়া আসছে। নাশতা তৈরি হচ্ছে। কিনো তার ঘ্রাণ পায়। কিন্তু সেসব সংগীত আলাদা। সব পরিবারের সংগীতই

আসলে পৃথক। সব বাড়িতেই নারী আছে; কিন্তু তারা জুয়ানা নয়। কিনো বয়সে তরুণ, শক্তিশালী। তার বাদামি কপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অবাধ্য কালো চুল। তার চোখে উষ্ণতা, সজীবতা। তার পাতলা গোঁফেও আছে পৌরুষের রুক্ষতা।

নাকের কাছ থেকে কম্বল নামিয়ে নিল কিনো। অন্ধকারের বিষবাষ্প কেটে গেছে। বাড়ির উপর পড়েছে সোনালি রোদ। বেড়ার কাছে দুটো মোরগ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফুঁসছে। মাথা নিচু করে ঘাড়ের রোঁয়া আর ডানা ফোলাচ্ছে। জবর লড়াই বাধবে এখনই। কিনো কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ দেখল একঝাঁক বুনোহাঁস—সোনালি রোদে ঝকমক করতে করতে সমুদ্র থেকে উড়ে আসছে পাহাড়ের দিকে। জেগে উঠেছে পৃথিবী। কিনো উঠে দাঁড়ায়, পা বাড়ায় ঘরের দিকে।

দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখে, জুয়ানা গনগনে চুলোর সামনে থেকে সরে এসেছে। কয়োটিটোকে দোলনায় শুইয়ে দিয়ে চুল আঁচড়াল সে। ঘন, কালো চুলগুলোর মাঝখানে সিঁথি টেনে দুটো বিনুনি করল, তারপর প্রান্তগুলো বেঁধে ফেলল পাতলা, সবুজ ফিতে দিয়ে। চুলোর পাশে উবু হয়ে বসল কিনো। তাওয়া থেকে তুলে নিল গরম রুটি। সসে ডুবিয়ে খেয়ে নিল। তারপর ঢকঢক করে খেল ঘরে-গাঁজানো খানিকটা মদ। ব্যস্, নাশতার পাট চুকল। বিশেষ পরবের দিন ছাড়া এর বাইরে অন্য কোনো নাশতা হয়নি কখনও। না, আরও একদিন দারুণ এক ভোজ হয়েছিল। পিঠের ভোজ। খেয়েদেয়ে কিনো প্রায় মরতে বসেছিল। কিনোর খাওয়া হয়ে গেলে চুলোর পাশে এসে বসল জুয়ানা। নাশতা খেল। তেমন কোনো কথা হল না দুজনের। কথা বলা, না-বলা অভ্যেসের ব্যাপার। খাওয়ার পর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল কিনো, হয়ে গেল কথা।

বেলা বাড়ে; রোদে তেতে ওঠে কুঁড়েঘরটা। বেড়ার ফাঁক দিয়ে রোদের ফালি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। একফালি পড়ে দোলনা আর দড়ির উপর। সে-আলোতে একটি দৃশ্য দেখে পাথরের মতো স্তম্ভিত হয়ে যায় স্বামী-স্ত্রী। কয়োটিটো ঘুমের মধ্যে একটুখানি নড়ে ওঠে। যে-দড়িতে তার দোলনা ঝুলে আছে ছাদ থেকে, সেটা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে একটা বিছা। তার হুল এখনও শিশুটির কাছ থেকে বেশ দূরে, তবু এক ঝটকায় বিঁধিয়ে দিতে কতক্ষণ?

কিনোর নাকের ছিদ্রে বাঁশির মতো বাজতে লাগল নিশ্বাস। প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপর হঠাৎ তার দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল, শরীরের টানটান ভাবটাও চলে গেল। তার মনে নতুন গানের দোলা লাগছে। সে গান শয়তান-অপদেবতা অড়ানোর গান। সংসারের সব শত্রু বিনাশের গান। এক গোপন, আদিম ও বর্বর, ভয়ংকর গান। তার আড়ালে সংসারের গানই মুখর হয়ে উঠেছে।

দড়ি বেয়ে হেলেদুলে দোলনায় নামল বিছাটা। জুয়ানা রুদ্ধশ্বাসে বিপদভঞ্জন মন্ত্র আওড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে মা মেরিকেও ডাকল। কিনোর শরীর ততক্ষণে সচল হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সে; হাতদুটো সামনে ধরা; তালু নিচে উপুড়

করা; অপলক দৃষ্টি; বিছার দিকে নিবদ্ধ। বিছাটা যেখানে, ঠিক তার নিচে শুয়ে আছে কয়োটিটো, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা ধরার জন্য। কিনো যখন প্রায় ধরে ফেলেছে, বিপদ টের পেয়ে থামল বিছাটা। ছোট ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে। লেজের দিকটা উঁচু করল। লেজের প্রান্তে চক্‌চক্ করে উঠল বিষাক্ত হুল।

অনড়, অকম্পিত শরীরে দাঁড়িয়ে থাকল কিনো। শুনতে পেল, জুয়ানা আবার ফিসফিস করে আওড়াচ্ছে সেই পুরনো মন্ত্র। শত্রুর শক্তিনাশের সুরও যেন ভেসে এল ওর কানে। বিছা যতক্ষণ না-নড়ে, কিনো নড়বে না। অতি ধীরে হাতদুটো এগিয়ে নিল সে। বিছাটা আসন্ন মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছে; লেজ নাড়াচ্ছে সতর্কতার সঙ্গে। ঠিক এমন সময় খিলখিল করে হেসে উঠে দড়ি নাড়াল কয়োটিটো। বিছা ধপ্ করে পড়ল নিচে। কিনো ধরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, পারল না। তার আঙুলের ফাঁক গলে শিশুটির কাঁধে পড়ল বিছা, আর সঙ্গে সঙ্গে হুল ফুটিয়ে দিল। কিনো অশিষ্ট গাল দিল বিছাটাকে। পুরে ফেলল মুঠোর ভিতর, তারপর আঙুলে দলে, পিষে ছাতু, বানিয়ে ফেলে দিল মেঝেতে। ততক্ষণে বাচ্চাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে যন্ত্রণায়। কিনোর সেদিকে খেয়াল নেই। শত্রুর অবশেষ রাখবে না সে। মেঝের উপর পা দিয়ে ঘষে ঘষে সরীসৃপটাকে সে সত্যি মিশিয়ে দিল মাটির সঙ্গে। তার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে মহারোষে, চোখে যেন আগুন জ্বলছে। কানে বাজছে শত্রুনিধনের উত্তাল গান।

জুয়ানা বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছে ততক্ষণে। দেখতে পেয়েছে, বিছা যেখানে দাঁত বসিয়েছে, সেখানে গর্ত হয়ে গেছে। গর্ত ঘিরে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে। সমানে চিৎকার করছে কয়োটিটো। জুয়ানা গর্তের উপর মুখ রেখে প্রবল বেগে শুষছে, তারপর থুতু ফেলছে, আবার শুষতে শুরু করছে।

হতভম্বের মতো পায়চারি করতে লাগল কিনো। কিছুই করার নেই। বেরিয়ে পড়ল সে।

বাচ্চাটার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এল। জমায়েত হল বাড়ির সামনে। দরজা আগলে দাঁড়াল কিনোর ভাই জুয়ান টমাস, তার মুটকি বউ অ্যাপোলোনিয়া আর তাদের চার ছেলেমেয়ে। ঘরে ঢোকার পথ বন্ধ করে রেখেছে তারা। অন্যরা ঢুকতে পারছে না, দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। একজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল একটি ছোট ছেলে, হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল কয়োটিটোর অবস্থা দেখার জন্যে। যারা সামনে ছিল, তারা পেছনের জনতার দিকে খবরটা পাচার করল: 'বিছা। বাচ্চার গায়ে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে।'

জুয়ানা কিছুক্ষণের জন্য থামল। ছোট গর্তটা অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। শোষণের জন্য সাদা দেখাচ্ছে জায়গাটা। কিন্তু লাল অংশ আরও ফুলে এর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আর ক্রমেই শক্ত দলার মতো হয়ে উঠল। এখানকার সবাই বিছার কথা জানে। বয়স্ক লোকের শরীরে এর হুল বিঁধলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, তার বেশি নয়। কিন্তু ওই বিষ সহজেই একটা বাচ্চাকে মেরে

ফেলার ক্ষমতা রাখে। সবাই জানে, দংশনের জায়গা প্রথমে ফুলে উঠবে, তারপর জ্বর আসবে। গলা আটকে আসতে পারে। তারপর প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হবে পেটে। বিষ যদি বেশি পরিমাণে শরীরে ঢুকে পড়ে, তো বাঁচানো যাবে না বাচ্চাটাকে। কিন্তু দেখা গেল, কয়োটিটোর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। দংশনের তীব্র যন্ত্রণা কমছে ধীরে ধীরে। চিৎকার বন্ধ করে গোঙাচ্ছে সে।

কিনো মাঝে মাঝে বিষম অবাক হয়ে বউটার কথা ভাবে। ওই শান্ত, একহারা মানুষের ভিতরটা যেন ইস্পাতের মতো দৃঢ়। স্বভাবে সুশীলা, বিনম্র, আবার সদা আনন্দময়ী, সহিষ্ণু। সন্তান প্রসবের সময় যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে গেছে শরীর, তবু চিৎকার করে ওঠেনি। ক্লান্তি আর খিদে চেপে রাখার ব্যাপারে কিনোর এক কাঠি ওপরে। ছিপনৌকায় উঠে যখন মাছ ধরে, তখন ওকে মনে হয় শক্তিশালী কোনো পুরুষের মতোই। এখনও তো রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিচ্ছে।

'ওগো, ডাক্তার ডাকো—ডাক্তার', জুয়ানা কঁকিয়ে ওঠে।

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের মধ্য থেকে কে যেন বলল, 'ডাক্তার আসবে না।'

কিনোরও তা-ই মনে হয়। জুয়ানার কাছে এসে সে বলল, 'ডাক্তার আসবে না।'

সিংহীর চোখের মতো ঠাণ্ডাচোখে জুয়ানা তার দিকে তাকাল। এই বাচ্চা জুয়ানার প্রথম সন্তান—ওর ভুবনের সবটুকু। ওর চোখে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ দেখতে পায় কিনো। আবার যেন সেই সংগীত ওর মস্তিষ্কের ভিতর স্বনিত হয়ে ওঠে—ধাতব স্বরভঙ্গিতে বেজে ওঠে সংসারের গান।

'তা হলে আমরাই যাব', বলেই জুয়ানা একহাতে তার গাঢ় নীলরঙের শাল টেনে নেয়। মাথার উপর দিয়ে পেঁচিয়ে একপ্রান্ত মুড়ে শিকলি তৈরি করে নেয় বাচ্চাটাকে ঝুলিয়ে নেবার জন্যে। অন্যপ্রান্ত মুঠোয় ধরে রাখে বাইরের প্রখর আলো থেকে তার চোখ বাঁচাতে।

দরজার লোকজন সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। কিনো হাঁটতে শুরু করল বউ-এর পিছু পিছু। বাচ্চাটা তখনও ফোঁপাচ্ছে। ওরা গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠল। গাড়ি চলে পথের দুপাশে গর্ত হয়ে গেছে। সেই পথ ধরে জুয়ানার পিছন পিছন হাঁটছে একদল মানুষ।

যেন ব্যাপারটা শুধু কিনোর পরিবারের নয়, গোটা মহল্লার সমস্যা। বিরাট এক মিছিল করে মৃদুপায়ে এগিয়ে গেল মহল্লার লোকজন—গ্রামের মাঝখান পর্যন্ত। সে-মিছিলের পুরোভাগে জুয়ানা আর কিনো, তাদের পিছনে জুয়ান টমাস আর অ্যাপোলোনিয়া। অ্যাপোলোনিয়ার প্রকাণ্ড পেট দুলছে ক্ষিপ্র তরঙ্গভঙ্গের মতো, অতিকষ্টে হাঁটছে সে। ওদের পিছন পিছন দুলকি চালে ছুটছে পাড়ার বাচ্চারা, বড়রাও আছে সঙ্গে। হলদে রঙের সূর্যটা সামনে ফেলেছে ওদের ছায়া; ওরা ছায়া মাড়াতে মাড়াতে পা ফেলছে।

গ্রামের সীমানায় এসে পড়ল ওরা। সেখানে কুঁড়েঘর শেষ; শুরু হয়েছে ইটের পাঁজর আর লোহার খাঁচার শহর। সেখানে চৌহদ্দির রুক্ষতার অন্তরালে ছায়া-

সুনিবিড় বাগান, পানির কুলুকুলু ধ্বনি। দেয়াল ঢেকে লতিয়ে ওঠে সাদা, ইট-লাল কিংবা রক্তরঙা বোগেনভিলিয়া। লুকোছাপা বাগান থেকে ভেসে আসে খাঁচায়-পোরা পাখির গান। আর শোনা যায় মর্মরের উপর আছড়ে পড়া পানির ছলাচ্ছল শব্দ।

মিছিল চলল চোখ-ধাঁধানো বিপণিকেন্দ্র পার হয়ে, গির্জার পাশ দিয়ে। আরও লোক এসে জুটেছে ওদের সঙ্গে। যারা নতুন এসেছে, নিচুস্বরে তাদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কীভাবে বাচ্চাটা বিছের কামড় খেয়েছে আর কীভাবে বাপ-মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

নবাগত লোকজন, বিশেষ করে গির্জার সামনে যেসব ভিক্ষুক বসেছিল তারা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জরিপ করল কিনো আর জুয়ানাকে। এরা অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় অতি বড় ওস্তাদ। তারা পলকের মধ্যে দেখে নিয়েছে জুয়ানার পুরনো নীল স্কার্ট, শালের উপর গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দু। তার চুলের ফিতের দাম কত হতে পারে, নির্ণয় করতে দেরি হয়নি। ঠিকঠাক বুঝে গেছে, কিনোর কম্বল কত পুরনো আর তার কাপড় ক' হাজারবার ধোলাই করা হয়েছে। তারা তাদের স্থান নির্ধারণ করেছে দারিদ্র্যসীমার নিচে, তারপর কী মজা হবে—দেখার জন্য যোগ দিয়েছে মিছিলে।

শহরের ভাবসাব জানতে ওই চারজন ভিক্ষুকের কিছু বাকি নেই। পাপস্বীকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে যেসব তরুণী, তাদের চোখের ভাষা আয়ত্ত করেছে তারা গভীর অভিনিবেশে। ওইসব তরুণী যখন বেরিয়ে আসে, তখন তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে তারা বলে দিতে পারে, কী ধরনের পাপ করেছে। শহরের সব ছোটখাটো কেলেঙ্কারি আর কিছু কিছু বড় অপরাধের ঘটনা ওদের জানা। তারা রাতের বেলায় শুয়ে থাকে গির্জায় শেডের নিচে, যার যার খুঁটির পাশে, যাতে তাদের না-জানিয়ে পাপস্খলনের জন্যে কেউ গির্জায় ঢুকতে না-পারে। আর হ্যাঁ, ডাক্তারকেও চেনে তারা। ডাক্তারের মূর্খতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ, রসনা কিংবা পাপ—সবই তাদের জানা। তারা ভালোমতন খবর রাখে, কীভাবে তড়িঘড়ি করে গর্ভপাতের কাজটা সারেন তিনি, তারপর সেই উপার্জন থেকে ছিটেফোঁটার মতো দু-একটা বাদামি পেনি ওদের দিকে ছুড়ে দেন।

সকালের দিকে গির্জায় লোক সমাগম হয়েছিল, এখন সব ফাঁকা। ভিক্ষে জোটার আশাও বিশেষ নেই। নানান দিক ভেবে ভিক্ষুকরা মিছিলের পিছন পিছন পা বাড়ানোই সাব্যস্ত করল। দেখতে তো তাদের কিছু বাকি নেই। এখন দেখাই যাক, পেটমোটা আলসে ডাক্তারটা বিছের কামড়-খাওয়া হতভাগা বাচ্চাটার জন্য কী করে।

মিছিল ছুটতে ছুটতে শেষপর্যন্ত পৌঁছল ডাক্তার সাহেবের বাড়ির প্রকাণ্ড গেটে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে পানি পড়ার শব্দ, খাঁচার পাখির গান। পাথরের মেঝের উপর কে যেন তুমুল শব্দে ঝাঁটা বোলাচ্ছে। ডাক্তার সাহেবের রান্নাঘর থেকে আসছে সুখাদ্যের ঘ্রাণ।

কিনো একমুহূর্ত দ্বিধায় ভোগে। ডাক্তার সাহেব তো আর ওদের লোক নন। ওই লোক সেই সম্প্রদায়ের, যারা প্রায় চারশো বছর ধরে কিনোদের গোষ্ঠীকে মারছে,

না-খাইয়ে রাখছে আর সর্বস্ব হরণ করছে। কিনোদের ঘৃণা করে তারা সবসময় সন্ত্রস্ত করে রাখে, যাতে নিচুজাতের লোকজন তাদের কাছে আসে নতমুখে, ভয়ে ভয়ে। ওই সম্প্রদায়ের লোকদের ভয় পেতেই অভ্যেস হয়ে গেছে কিনোর। কখনও যদি তাদের কাছে যেতে হয়, বেজায় দুর্বল বোধ করে। ভয় হয়। রাগও হয় সেইসঙ্গে। কথায় বলে : রোষ আর ত্রাস চলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। কিনোর তো প্রায়ই মনে হয়, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে তাকে খুন করা সহজ। কারণ কিনোদের সঙ্গে তারা এমনভাবে কথা বলে যেন ওরা মানুষ নয়। কিনো ডানহাত তুলে গেটের গোল ঘণ্টি বাজাতে শুরু করেই বুঝতে পারল, রাগে ওর শরীর ফুলে উঠছে, কানের ভিতর বেজে উঠেছে শত্রুনিধনের সেই সুর, অথচ কখন যে আবার বাঁ-হাতে মাথার টুপি খুলতে উদ্যত হয়েছে, কে জানে!

লোহার ঘণ্টি বাজতে শুরু করল। টুপি খুলল কিনো, তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। জুয়ানার কোলে কয়োটিটো তখনও গোঙাচ্ছে। জুয়ানা আদর করছে বাচ্চাকে। জনতা সব ভালোভাবে শোনা আর দেখার জন্য আরও কাছে ঘনিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পর কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হল গেটটা। তার মধ্যদিয়ে কিনোর চোখে পড়ল বাগানের শ্যামল স্নিগ্ধতা আর ছোট ঝরনার ঝরঝর ধারা। যে-লোক সেই ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল, সে কিনোরই সম্প্রদায়ের একজন। কিনো প্রাচীন ভাষায় কথা বলল তার সঙ্গে। 'ছোট শিশু আমাদের প্রথম সন্তান—তাকে বৃশ্চিক দংশন করেছে', কিনো বলল। 'একজন ভালো বদ্যির শুশ্রূষা আবশ্যক।'

গেট আবার বুজে গেল। ভৃত্যটির ইচ্ছে নেই তার সঙ্গে প্রাচীন ভাষায় কথা বলার। সে বলল, 'একটু দাঁড়াও, ভিতরে গিয়ে খবর দিচ্ছি।' ভালোভাবে দরজা লাগিয়ে অন্দরমহলে চলে গেল সে। ধাঁধানো রোদে সংসক্ত জনতার কালো ছায়া পড়েছে সামনের সাদা দেয়ালে।

চেম্বারে ডাক্তার সাহেব তাঁর উঁচু বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর পরনে প্যারিস থেকে আনা লাল ঢেউ-খেলানো সিল্কের ড্রেসিং গাউন। আজকাল গায়ে একটু ছোটই হয়, বিশেষ করে বোতাম লাগানোর পর বুকের কাছে বেশ শক্ত হয়ে এঁটে বসে। তাঁর কোলের উপর রুপার ট্রে, তাতে রুপার পটে চকোলেট ড্রিংকস। ছোট, পলকা চিনেমাটির কাপে ঢেলে চকোলেট পান করছেন তিনি। একটা হাস্যকর দৃশ্য। ইয়া বড় হাতে সেই খুদে কাপ তুলে ধরছেন, বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে। অন্য আঙুলগুলো ছড়িয়ে দূরে সরিয়ে রাখছেন, যাতে সেগুলো ব্যাঘাত না ঘটায়। ফুলে-ওঠা ছোট ছোট পেশির খাঁচায় পোরা তাঁর চোখগুলো স্থির হয়ে থাকল। বিরক্তিতে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে মুখ। দিনদিন মোটা হয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, গলার স্বর রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে, গলার ওপর চেপে বসছে চর্বি। তাঁর পাশে টেবিলের উপর একটা ছোট ধাতব-ঘণ্টা আর সিগারেটের পাত্র। কামরা-ভর্তি আসবাব যেমন জমকালো, তেমনই ভারী। দেয়ালের ছবিগুলো আধ্যাত্মিক ধরনের। তাঁর মৃতা স্ত্রীর প্রকাণ্ড ছবিটি ঝাপসা হয়ে গেছে। কে জানে, দেবতাদের কী ইচ্ছে! বিরাট ভূসম্পত্তির মায়া কাটিয়ে

হয়তো স্বর্গেই আছেন তিনি। ডাক্তার সাহেব একবার সামান্য কয়েকদিনের জন্য বিদেশভ্রমণে গিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনের সবটাই কাটাচ্ছেন আবার ফ্রান্সে যাবার আকাঙ্ক্ষায় আর আকুলিবিকুলি স্মৃতিতর্পণে। তাঁর মতে, 'ওটাই হচ্ছে সুসভ্য জীবন', যার আসল মানে, বেশ অল্প আয়ে সেখানে তিনি এক উপপত্নী রাখতে পেরেছিলেন আর মাঝেমধ্যে রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া চলত। কাপে দ্বিতীয় দফা চকোলেট ঢাললেন তিনি, আঙুলের চাপে গুঁড়া করলেন একটা মিষ্টি বিস্কুট। গেট থেকে ফিরে ভৃত্যটি খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'অ্যাঁ?'

'এক খুদে ইন্ডিয়ান এসেছে একটা বাচ্চা নিয়ে। বলছে, বিছে কামড়ে দিয়েছে।'

রাগ চড়ার আগে হাতের কাপ ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন ডাক্তার সাহেব।

'ওই খুদে ইন্ডিয়ানগুলো'র পোকার কামড় সারানো ছাড়া কি আর কোনো কাজ নেই আমার? আমি তো ডাক্তার, পশু-চিকিৎসক নই।'

ভৃত্য বলল, 'যা বলেছেন, মালিক।'

'টাকাপয়সা এনেছে?' ডাক্তার সাহেব জানতে চান। 'না, টাকাপয়সা তারা কখনই আনবে না। দুনিয়ায় যেন শুধু আমি, আমি একাই আছি ওইসব ফালতু কাজের জন্য। পেরেশান হয়ে গেছি একেবারে। যাও, জেনে এসো, টাকা এনেছে কি না।'

গেটে ফিরে গিয়ে ভৃত্য সামান্য ফাঁক করে ধরল দরজাটা, তাকাল অপেক্ষমাণ জনতার দিকে। এবার অবশ্য প্রাচীন ভাষাতেই বলল, 'চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ এনেছ কি?'

তখন কিনো কম্বলের আড়ালে কোনো এক গোপন জায়গায় হাত দিল। বার করে আনল অনেক ভাঁজে ভাঁজ-করা একটা কাগজ। একের পর এক ভাঁজ খুলল। অবশেষে দেখা গেল, তার ভিতর আছে ছোট ছোট আটটা মুক্তোর দানা। যেমনি বাজে আকার, তেমনি ফ্যাকাশে, কুৎসিত রং। আলসারের মতো দেখতে। চ্যাপটা। দাম-টাম আছে বলে মনে হয় না। পরীক্ষা করে মোড়কটা ফেরত দিল ভৃত্য।

'ডাক্তার সাহেব বাইরে গেছেন। সিরিয়াস কেসে ডাক পড়েছে।' বলেই তাড়াহুড়া করে গেট বন্ধ করে দিল লোকটা, যেন লজ্জা ঢাকতেই।

তখন যেন পুরো মিছিলেই লজ্জা নেমে আসে। মরমে মরে যাবার মতো অবস্থা সবার। ভিক্ষুকরা ফিরে গেল গির্জের সিঁড়িতে। বাইরে থেকে যারা মিছিলে জুটেছিল, তারা সরে গেল। আত্মীয়-স্বজনেরাও কেটে পড়ল একে একে। কিনো এতগুলো লোকের সামনে যে-লজ্জা পেয়েছে, তার কোনো চিহ্ন নিজেদের মুখে রাখতে চায় না তারা।

জুয়ানাকে পাশে নিয়ে কিনো অনেকক্ষণ সেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। ধীরে ধীরে মাথায় রাখল জীর্ণ টুপিটা। হঠাৎ, কোনো সতর্কতা ছাড়াই প্রবল বেগে ঘুসি মারল গেটের ওপর। তারপর স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল চৌচির হয়ে যাওয়া হাতখানার দিকে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলগলিয়ে নেমে আসছে উষ্ণ রক্ত।

দুই

শহরটা এক প্রশস্ত মোহনার তীরে। হলুদ রঙের প্লাস্টার-করা দালানগুলো আঁকড়ে ধরে আছে বেলাভূমি। সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নায়ারিট থেকে আসা সাদা আর নীল ক্যানুগুলো। আরও কিছু ক্যানু সেখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যুগ-যুগ ধরে। ওইসব নৌকার গায়ে এক অদ্ভুত জল-রোধক প্লাস্টার, শক্ত খোলসের মতো। কীভাবে বানায় ওই প্লাস্টার, মৎস্যজীবীরা কাউকে বলে না, গোপন রাখে সে-তথ্য। উঁচু উঁচু ক্যানুগুলোর সৌষ্ঠব দেখবার মতো। সামনে-পিছনে, দুদিকের গলুই চমৎকারভাবে বাঁকানো; মাঝখানে ছোট ছোট তেকোণা পাল ওড়ানোর জন্যে মাস্তুল লাগানোর ব্যবস্থা।

সৈকত বলতে হলুদরঙের বালিয়াড়ি। কিন্তু একেবারে জলের কিনারায় তার জায়গা দখল করেছে ঝিনুক আর শৈবালের কুচি। ছোট ছোট কাঁকড়াগুলো বালুর গর্তে বসে ভুড়ভুড়ি কাটে। অল্প পানির নিচে বালু আর পাথরকুচির আড়ালে ঘর বেঁধেছে যে ছোট ছোট চিংড়ি, তারা ছোটাছুটি করে বেড়ায়। সমুদ্রের তলদেশ সমৃদ্ধ করে রেখেছে কিছু প্রাণী আর উদ্ভিদ। মৃদু স্রোতে শৈবাল নড়ে তিরতির করে, দুলে ওঠে সবুজ ঈলগাছের ঝোপ, তাদের ডালপালায় ঝুলে থাকে ছোট ছোট সী হর্স মাছ। ঈলঝোপে আরও অনেককিছু থাকে। একরকমের বিষাক্ত মাছ শুয়ে থাকে, গায়ে অসংখ্য ফুটকি। তাদের শরীরের উপর দিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় ঝলমলে রঙের কাঁকড়া।

জোয়ারের উচ্ছ্বাসে সৈকতে এসে আটকে যায় মরা মাছ কিংবা সামুদ্রিক পাখির দেহ। ওইসব খাবারের খোঁজে বেলাভূমিতে এসে ঘুরে বেড়ায় শহরের যত ক্ষুধার্ত কুকুর, ক্ষুধার্ত শুয়োর।

তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। আবছা মরীচিকা চোখে পড়ে। খামখেয়ালি বাতাস সমুদ্রের বুকের কোন্ জিনিসকে যে বড় করে দেখায় আর কোন্ জিনিসকে আড়াল করে দেয়, বোঝা দায়। সব দৃশ্যকেই অবাস্তব মনে হয়, ভরসা করা যায় না দৃষ্টিক্ষমতার ওপর। মনে হয়, ওই সমুদ্র আর মাটির সবকিছুতে আছে স্বপ্নের রহস্য। হয়তো তাই সমুদ্রসিকস্তি মানুষেরা নিজেদের দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আত্মা আর চেতনার ব্যাপারগুলোর ওপর। মোহনার ওপারে শহর অভিমুখে টানা গরানগাছের একটি সারি চোখে পড়ে খুব স্পষ্টভাবে, আবার অন্য একটি সারিকে মনে হয় অস্পষ্ট কালো আর সবুজ রেখার মতো। দূরের তটরেখার কিছুটা মিলিয়ে গেছে কাঁপা-কাঁপা চকমকির মধ্যে, মনে হচ্ছে ওটা কূল নয়, পানি। দেখার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যা দেখা গেছে, তা যে ওখানে ছিল, এমন কোনো প্রমাণ নেই। আবার ছিল না, তা-ও বলা যাবে না। সাগরের মানুষেরা এসবে অবাক হয় না। তাদের ধারণা, সব জায়গাই ওইরকম। সাগরের বুকজুড়ে আবছা তামার মতো কী যেন বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সকালের তপ্ত সূর্য ঘা দিচ্ছে তার ওপর, উন্মত্ত তরঙ্গ তুলছে।

জেলেদের কুঁড়েঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে বেলাভূমির দিকে পিঠ দিয়ে, গ্রামের ডানদিক ঘেঁষে। কাছেই সারিসারি বাঁধা আছে ক্যানুগুলো।

কিনো আর জুয়ানা ধীরে ধীরে নেমে এল সৈকতে, এগিয়ে গেল কিনোর ক্যানুর দিকে। ওই নৌকার চেয়ে দামি জিনিস ওর পৃথিবীতে আর নেই। অনেক পুরনো নৌকাটা। কিনোর দাদা কিনেছিলেন নায়ারিট থেকে। তিনি কিনোর বাপকে দিয়ে যান। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে কিনো। একই সঙ্গে জিনিসটা সম্পত্তি আর খাদ্যের উৎস। কারণ খুব সোজা। নৌকাওয়ালা একজন মানুষ নারীকে খাবারের নিশ্চয়তা দিতে পারে। নৌকা হচ্ছে অনাহারের বিরুদ্ধে বর্মের মতো। প্রত্যেক বছর কিনো তার নৌকার খোলস পাল্টায়। গোপন কৌশলে শক্ত প্লাস্টারে ঢেকে দেয়। বাপ তাকে শিখিয়ে গেছেন সেই কৌশল। ক্যানুর সামনের গলুইয়ে হাত বোলাল কিনো প্রতিদিনের মতো। ক্যানুর পাশে, বালুচরের উপর রাখল ডুব দেবার সরঞ্জাম, ঝুড়ি আর দুইপ্রস্থ দড়ি। গায়ের কম্বল খুলে ভাঁজ করল, তারপর গলুইয়ের উপর রাখল।

জুয়ানা কয়োটিটোকে শুইয়ে দিল কম্বলের উপর। গায়ের শাল খুলে ঢেকে দিল তার শরীর, যাতে রোদ না-লাগে। বাচ্চাটি এখন শান্ত। কিন্তু কাঁধের ফোলাটা বাড়তে বাড়তে চলে এসেছে প্রায় গলা পর্যন্ত। কানে আর মুখেও ফোলা-ফোলা ভাব; জ্বরে লাল হয়ে গেছে। জুয়ানা পানিতে নামল। তুলে আনল কয়েকটা সামুদ্রিক গাছগাছড়া। হাতের তালুতে তাই ডলে পুলটিস বানাল, তারপর লেপ্টে দিল ফোলা জায়গায়। কিন্তু যে-ওষুধ সহজে বানানো যায় আর পয়সা লাগে না, তার আর দাম কী? কয়োটিটোর পেট-কামড়ানি শুরু হয়নি। হয়তো জুয়ানা সময়মতো বিষ শুষে তুলে নিয়েছিল, তাই। কিন্তু প্রথম সন্তানকে নিয়ে যে দুর্ভাবনা—সে-বিষ তো তুলতে পারেনি জুয়ানা। বাচ্চার আরোগ্যের জন্যে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও জানানো যাচ্ছে না। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, সেটা ঠিক নয়। তাই সে প্রার্থনা করেছে একটা দামি মুক্তার জন্যে। সেটা পাওয়া গেলে ডাক্তার ডাকার পয়সা জুটবে। সাগরের মরীচিকার মতোই এখানকার মানুষদের মন—অধ্যাত্ম আর রহস্যে ভরা।

কিনো আর জুয়ানা ধাক্কা দিয়ে ডাঙা থেকে পানিতে নামাল নৌকাটা। সামনের গলুই ভাসতেই জুয়ানা তাতে উঠে বসল। কিনো জল ভেঙে এগিয়ে যায় পেছনের গলুই ধরে ঠেলতে ঠেলতে। তারপর যখন ভালোভাবে ভেসে ওঠে নৌকা, ছোট ছোট ভেঙে-পড়া ঢেউয়ে দুলতে থাকে, তখন সে-ও উঠে পড়ে। দুজনে মিলে একতালে বাইতে শুরু করে দুই-ফলার বৈঠা। সমুদ্রের পানি চিরে সাঁ সাঁ শব্দে ক্যানু ছুটতে থাকে। অন্যসব মুক্তা-শিকারিরা চলে গেছে অনেক আগেই। কিছুক্ষণের মধ্যে কিনো দেখতে পেল তাদের নৌকার ঝাঁক—ঝাপসা দেখাচ্ছে জায়গাটা—ঠিক ওইখানে, সমুদ্রতলে মুক্তা-শুক্তির মেলা।

পানি ভেদ করে চলে গেছে আলো—সমুদ্রের তলা দেখা যায়। মুক্তাবতী ঝিনুকে ছেয়ে আছে তলদেশ। ঝিনুকের কুচি আর ভাঙা খোলা ছড়িয়ে আছে চুমকির কাজের মতো। এই হচ্ছে সেই খনি, যার সম্পদে ধনী স্পেনের রাজা। বিগত বছরগুলোতে

এ-দৌলতে স্পেন ইউরোপের পরাশক্তি হয়ে উঠেছে। এখান থেকেই উশুল হচ্ছে রাজার যুদ্ধের ব্যয়ভার আর আত্মার শান্তি বাবদ গির্জা-সাজানোর খরচ। সেখানে আছে স্কার্টের চুমকির মতো খোলায় ঢাকা ধূসর ঝিনুকের মেলা, শামুক-গুগলিতে ভরা শুক্তির গা-বেয়ে-ওঠা ছোট ছোট হরেক উদ্ভিদ। খুদে কাঁকড়া চরে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। বছরের-পর-বছর মানুষ ওই ঝিনুক তুলে খোলা ফাটিয়ে মুক্তা খুঁজছে। আশপাশেই আবার অপেক্ষায় থাকে সুযোগসন্ধানী মাছের ঝাঁক। খোলা ভেঙে পেট পরীক্ষা করার পর ঝিনুকটা ফেলে দেওয়া হয়। মাছেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোকরাতে শুরু করে পরিত্যক্ত ঝিনুকের পেট। মুক্তা মেলে না সহজে। যদি কেউ পায়, ধরে নেওয়া হয়, জোর বরাত তার। ঈশ্বর কিংবা দেবতা—কিংবা হয়তো উভয়ের অনুকম্পার জোর আছে তার পেছনে।

কিনোর সঙ্গে আছে দুগাছা দড়ি। একটার প্রান্ত বাঁধা ভারী পাথরের সঙ্গে। অন্যটা ঝুড়ির সঙ্গে লাগানো হয়েছে। সে গা থেকে শার্ট আর ট্রাউজার খুলে ফেলল। হ্যাট খুলে রাখল ক্যানুর নিচে। পানিতে একধরনের তেলতেলে, মসৃণভাব। কিনোর একহাতে পাথর, অন্য হাতে ঝুড়ি। পা-দুটো নামিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাথরের ভারে একটানে চলে এল সাগরতলে। পিঠের কাছে সুড়সুড়ি কাটতে লাগল বুদবুদ। একসময় উপরের দিকে তাকাল সে। স্বচ্ছ সরসীর মতো মনে হচ্ছে পানির উপরের দিকটা। নৌকাগুলোর তলা দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে তরঙ্গায়িত আয়নার গায়ে লেপটে আছে সেগুলো।

সাবধানে এগোল কিনো। কাদা-বালি যাতে জল ঘোলা না-করে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে। পাথরের উপর দড়ির ফাঁসে পা আটকে রেখে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে শুরু করল সে। ঝিনুক কেটে ফাঁক করে পরীক্ষা করল—কখনও আলাদা একটা, আবার কখনও কয়েকটি একত্রে। তারপর কিছু কিছু ঝিনুক ঝুড়িতে রাখল কিনো।

এসব নতুন কিছু নয়; সব পুরনো দৃশ্য। এইসব নিয়ে কিনোদের পূর্বপুরুষেরা গান বেঁধেছে। গান বেঁধেছে মাছ নিয়ে, ক্রুদ্ধ আর শান্ত সমুদ্র নিয়ে, আলো আর আঁধার কিংবা সূর্য আর চাঁদ নিয়ে। সব গানই কিনো আর তার প্রতিবেশীদের জানা। অনেক গান ভুলে গেছে ওরা, তবু কিছু কিছু মনে পড়ে। দেখতে দেখতে ঝুড়ি ভরে ওঠে। একটি গান ওর মনের গভীরে বেজে ওঠে। সে-গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করে বুকের ধুকপুকানি। ফুসফুসে জমিয়ে রাখা অক্সিজেন একটু একটু করে খরচ হয়ে যায়, আর অমনি বেজে ওঠে নতুন তালের মাদল। সে-বাজনার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সুর তোলে হালকা সবুজ জল, নাম-না-জানা সেইসব প্রাণী কিংবা মাছের ঝাঁক, যারা ছুটে বেড়ায় দিন-রাত। কিন্তু ওই সংগীতের অন্তরাল থেকে অন্য এক সংগীতের লহরি তৈরি হয় গোপনে। তার নাম মুক্তার সংগীত। শুক্তিবীজের গান।

হতেও তো পারে, ঝুড়িতে রাখা সব ঝিনুকের পেটেই আছে একটি করে অমূল্য মুক্তা। না-ও হতে পারে। হয়তো একটি মুক্তাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু দেবতাদের সুনজর আর সৌভাগ্য যদি মিলেই যায়, কী না-হয়? আর কিনো তো জানে, উপরে,

নৌকার পাটাতনে প্রার্থনায় বসেছে জুয়ানা। শক্ত, টানটান হয়ে আছে তার মাংসপেশি, প্রচণ্ড জোর খাটিয়ে ভাগ্য জয় করবে, দেবতাদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবে ভাগ্য। ভাগ্য তার একান্তই দরকার কয়োটিটোর ফোলা কাঁধের চিকিৎসার জন্যে। প্রয়োজন বড় বেশি, প্রার্থনার জোরও কম নয়। আজ সকালে তাই শুক্তিবীজের গোপন গানও হতে পারে মহাপরাক্রমশালী। এইসব শব্দমালা ক্রমেই তালগোল পাকিয়ে রচনা করল নতুন এক গান—সাগরতলের গান।

কিনোর বয়স কম; শরীরে যৌবনের তেজ। অনায়াসে দু'মিনিটের বেশি ডুবে থাকতে পারে পানির নিচে। ইচ্ছে করেই আরও বেশি সময় কাজ করল। খুঁজে বার করল সবচেয়ে বড় ঝিনুকটি। খোলার খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে। খুবই প্রাচীন জিনিস, বোঝা যায়। আরও একটু ফাঁক করতেই ভিতরের নরম শাঁস বেরিয়ে পড়ল। আর ঠোঁটের মতো সেই শাঁসের ভিতর থেকে যে উঁকি দিল স্বর্গীয় আলোর রশ্মি। বুকের ভিতর প্রচণ্ড ধুকপুকানি শুরু হল কিনোর। সে-তালে তাল দিয়ে কানে ঝংকার দিয়ে উঠল সম্ভাব্য সেই শুক্তিবীজের গান। ঝিনুকটা সে চেপে ধরল বুকের সঙ্গে। পাথরের বাঁধন থেকে পা ছাড়িয়ে নিল এক ঝটকায়। তরতর করে উপরে উঠে এল। সোনালি রোদে ঝিকমিক করছে তার কালো চুল। ক্যানুর গলুই আঁকড়ে ধরে পাটাতনে রাখল ঝিনুকটা।

জুয়ানা স্থির রাখল নৌকা, কিনোকে উঠে বসতে সাহায্য করল। উত্তেজনায় ধক্‌ধক্ করছে তার চোখ। তবু অকম্পিত হাতে দড়ি টেনে পাথর উপরে তুলল। ঝুড়িটাও টেনে তোলা হল ওইভাবে। জুয়ানা জানে, উত্তেজনার কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু সে নির্বিকার থাকার ভান করল। কোনো ভালো জিনিস বেশি চাইতে নেই। এতে ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ ফিরিয়ে নেন। অনেককিছু চাইতে হলে খুব সাবধানী হতে হয়। তবেই দেবতারা কিছু দেন। এতসব জানা সত্ত্বেও জুয়ানা দমবন্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকে। কিনো সাবধানে বের করল ছোট, শক্ত ছুরিটা। আশাভরা চোখে তাকাল ঝুড়ির দিকে। সেই বিশেষ ঝিনুকটা সবার শেষে খুলবে, ঠিক করল কিনো। ঝুড়ি থেকে ছোট একটা ঝিনুক তুলে খোলা ছাড়িয়ে ফেলল। ভিতরের মাংসপেশির ভাঁজগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করে ফেলে দিল জলে। তারপর, যেন হঠাৎ চোখে পড়েছে, এমনিভাবে তাকাল বড় ঝিনুকটার দিকে। আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল কিনো। ঝিনুকটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল। খোলা ভাঙতে ভয় হচ্ছে। কে জানে ভিতরে কী আছে। হয়তো সেরেফ চোখের ধাঁধা। সাগরতলের মায়াবী আলোয় অনেক রহস্য থাকে।

জুয়ানা তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অপেক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠল। কয়োটিটোর মাথায় হাত রেখে নিচুস্বরে বলল, 'আহা, খোলোই না!'

কুশলী হাতে ঝিনুকের খোলার ধার ঘেঁষে ছুরি চালাল কিনো। বুঝতে দেরি হল না, ভিতরের পেশি টানটান হয়ে আছে। সাবধানে ছুরির চাড় দিয়ে খোলা ফাটাল সে। ঠোঁটের মতো ফাঁক হল পেশির মাঝখানটা। আবার বুজে গেল।

কিনো এক-পরত পেশি উঁচু করে ধরে। চাঁদের হাসি ছড়িয়ে ঝিকমিক করে উঠল মুক্তো। সেই শুক্তিবীজ! অকলঙ্ক চন্দ্রকান্ত মণি। বুকের মধ্যে ধরেছে আলো, তাকে শোধন করেছে, তারপর অপরূপ রুপালি ভাস্বরতায় ফিরিয়ে দিয়েছে। আকারে বেশবড় মণিটা। শঙ্খচিলের ডিমের মতোই। পৃথিবীতে এরচেয়ে দামি মুক্তা আজও পাওয়া যায়নি।

জুয়ানার গলা থেকে আর্তনাদের স্বর বেরিয়ে আসে। আর কিনোর অন্তরজুড়ে বেজে ওঠে শুক্তিবীজের গোপন গান—অমলিন, অপরূপ সুর—উষ্ণ, গভীর ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত হতে থাকে, কেঁপে কেঁপে ওঠে বিজয়ের উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে। কিনো অপলক তাকিয়ে আছে মুক্তার দিকে। ওই মুক্তার মাঝখানে নতুন স্বপ্ন ফেনিয়ে ওঠে। নির্জীব হয়ে আসা পেশি থেকে আলতো করে মুক্তাটা হাতে তুলে নেয় কিনো। উল্টেপাল্টে দেখে, দুপাশের বাঁক ঠিক আছে কি না। জুয়ানা আরও কাছে এগিয়ে এসে দেখে কিনোর হাতে-ধরা মুক্তা। ওই হাতখানা ডাক্তারের গেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল। ফাটা, ভাঙা গাঁটগুলো ধূসর হয়ে গেছে সাগরের পানি লেগে।

জুয়ানা তাড়াতাড়ি কয়োটিটোর কাছে ছুটে যায়। বাপের কম্বলের উপর শুয়ে আছে শিশুটি। টোটকা ওষুধের পুলটিস সরিয়ে জুয়ানা তার কাঁধের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে : 'কিনো—'

মুক্তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকায় কিনো। শিশুর কাঁধের ফোলা কমে গেছে। বিষ নেমে যাচ্ছে শরীর থেকে। মুক্তাটা হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে মাথা পিছনে হেলিয়ে প্রবল চিৎকার করে ওঠে কিনো। আবেগ চেপে রাখতে পারছে না সে। তার চোখের মণি গড়িয়ে পড়ে, শরীর হয়ে ওঠে টানটান। অন্য নৌকাগুলো থেকে হতভম্ব মানুষেরা ফিরে তাকায় কিনোর নৌকার দিকে। তারপর প্রবলগতিতে দাঁড় বেয়ে ছুটে আসতে থাকে।

তিন

শহর আসলে হাত-পা-আলা প্রাণীর মতোই। শহরের নার্ভাস সিসটেম আছে। মাথা, কাঁধ, পা সবই আছে। একটি শহর সবসময় অন্য শহরগুলো থেকে আলাদা রকমের হয়। তার মানে হুবহু একই রকমের দুটো শহর কখনও পাওয়া যাবে না। শহরের এক নিজস্ব অনুভূতি আর আবেগ আছে। এখানে খবর কীভাবে রাষ্ট্র হয়, সে এক দুর্ভেদ্য রহস্য। কোনো খবর পেয়ে অন্যদের জানানোর জন্যে ছোটছেলেরা যেমন হুটোপাটি করে ছোটে, কিংবা গিন্নিরা যেমন পাশের বাড়ির মহিলাদের কাছে ত্বরিতগতিতে খবর চালান করেন, তার চেয়ে অনেক দ্রুত খবর চাউর হয়ে যায় এখানে।

কিনো, জুয়ানা আর অন্য সঙ্গীরা বাড়ি এসে পৌঁছানোর আগেই শহরময় জানাজানি হয়ে গেছে, কিনো পেয়েছে পৃথিবীর সেরা মুক্তাটি। উত্তেজনায় কাঁপছে

পুরো লোকালয়। বাচ্চারা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে যাচ্ছে মায়ের কাছে। খবর দেবে কি, মা তো আগেই জেনেছে!

কুঁড়েঘরগুলো ছাড়িয়ে এই খবর সফেন ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে ইটের পাঁজর আর লোহার খাঁচার শহরে। গির্জার পুরোহিত পায়চারি করছিলেন বাগানে। তাঁর কানে গেছে কথাটা। তিনি ভাবতে চেষ্টা করছেন, ঠিক কত দাম হতে পারে মুক্তাটার! চোখের দৃষ্টিতে ভাবনার রেখা ফুটে ওঠে। তাঁর মনে পড়ে যায়, গির্জাটার কোন্ কোন্ জায়গায় মেরামত করাতে হবে। ভাবতে চেষ্টা করেন, কিনোর বিয়ে পড়িয়েছিলেন কি না কিংবা তার বাচ্চাকে ব্যাপটাইজ করেছিলেন কি না।

দোকানিরা শুনল খবরটা। জামাকাপড়ের স্তূপের দিকে তাকাল তারা; বিক্রি হচ্ছে না জিনিসগুলো।

খবর গেল ডাক্তার সাহেবের কানে। তিনি রোগী দেখছিলেন। রোগীর একমাত্র রোগ বার্ধক্য। আর কিছু নয়। কিন্তু রোগী বা ডাক্তার—কেউ তা স্বীকার করবেন না। তাঁকে যখন বুঝিয়ে বলা হল, কিনো লোকটা কে, ডাক্তার অবিচল প্রজ্ঞার সঙ্গে বললেন, 'উনি তো আমার পেশেন্ট! আমি ওনার বাচ্চার চিকিৎসা করছি। বিছে কামড়েছিল তাকে।' মস্ত ভাঁটার মতো চোখে মণি নেচে ওঠে তাঁর। প্যারিসের কথা মনে হয়ে যায়। মনে পড়ে যে-রুমটায় থাকতেন বড় আরাম-আয়েশে, তার কথা। সেই সঙ্গী নারীর কথাও মনে পড়ল। বৃদ্ধা রোগীর দিকে তাকিয়ে মানসনেত্রে দেখতে লাগলেন ডাক্তার, তিনি প্যারিসের এক রেস্তোরাঁয় বসে আছেন আর পরমাসুন্দরী ওয়েটার ওয়াইনের বোতল খুলে দিচ্ছে।

গির্জার সামনে যে-ভিক্ষুকরা ঝিমোচ্ছিল, তারা চাঙা হয়ে উঠল এই খবর পেয়ে। হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারা জানে, যেসব গরিব মানুষ হঠাৎ বড়লোক হয়, তাদের চেয়ে বেশি ভিক্ষা দুনিয়ায় কেউ দেয় না।

কিনো পেয়েছে পৃথিবীর সেরা মুক্তা। বাজারের ছোট ছোট অফিসে মুক্তা-ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করছে চেয়ারে বসে। মুক্তাশিকারিরা এল। তুমুল ঝগড়াঝাঁটি আর হইচই হল নিম্নতর দামে বিক্রেতাদের রাজি করানোর ব্যাপারে। একজন মুক্তাশিকারি অবশ্য যে-দামে রাজি হল, তার চেয়ে কম দাম হাঁকার সাহস হয়নি কারও। সে-বেচারা বিষম হতাশায় মুষড়ে পড়ে তার মুক্তা দান করল গির্জাকে। এভাবে শেষ হল কেনার পালা।

অস্থির হাতে মুক্তাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ব্যবসায়ীরা ভাবছিল, ওগুলো যদি নিজেদের হত! কারণ মুক্তা কিনবে কে? খরিদ্দার তো নেই বললেই চলে। শুধু একজন মুক্তা কেনে তাদের বাজারে। সে ওই ব্যবসায়ীদের আলাদা আলাদা অফিসে বসিয়েছে একধরনের প্রতিযোগিতা দেখানোর জন্য। তাদের কাছেও কিনোর মুক্তার খবর পৌঁছল। চোখ জ্বলে উঠল তাদের। প্রত্যেকেই ভাবে, মহাজনকে যদি সরানো যেত! অন্য কাউকে বসানো যেত ওই জায়গায়! প্রত্যেকেই ভাবে, যদি কিছু মূলধন জোগাড় করে নতুন করে শুরু করা যেত ব্যবসাটা!

সবধরনের মানুষের মধ্যে আগ্রহ জন্মেছে কিনো সম্পর্কে। কিনোর হাতে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মুক্তা। সে-মুক্তা বেচবে কিনো। মুক্তার সুবাস মিশল মানুষের বিচিত্র সুবাসের সঙ্গে, তলানির মতো পড়ে রইল অদ্ভুত গাঢ় রহস্য। সবাই যেন হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছে কিনোর মুক্তার সঙ্গে। কিনোর মুক্তা জড়িয়ে পড়েছে স্বপ্ন আর সম্ভাবনার সঙ্গে; প্রকল্প, পরিকল্পনা আর ভবিষ্যতের সঙ্গে; আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে; প্রয়োজন আর চাহিদার সঙ্গে; কামনা-বাসনার সঙ্গে। এই জটিল সম্পর্কের পথের মাঝখানে মাত্র একজন দাঁড়িয়ে আছে অবিচল। কিনো। কিনো এখন সবার অভিন্ন শত্রু। তার মুক্তা পাবার খবর গোটা শহরে ছড়িয়ে দিয়েছে এক অশুভ কালো ছায়া। এই অমঙ্গলের তুলনা বিছা; সুখাদ্যের ঘ্রাণ পেলে যেমন চনমন করে ওঠে খিদে, কিংবা ভালোবাসা হারিয়ে যাওয়ার পর হৃদয় যেমন ধুঁকতে থাকে অসীম নিঃসঙ্গতায়। যেন বিছা হুল ফুটিয়ে দিয়েছে শহরের শরীরে; বিষে জর্জরিত দেহ ফুলে উঠছে।

এসব অবশ্য কিনো আর জুয়ানার জানা নেই। তাদের প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে। ওরা ভাবে, শহরের অন্য সবাই ওই আনন্দের শরিক। জুয়ান টমাস আর তার বউ অ্যাপোলোনিয়া সত্যি খুশি হয়েছে। ওরা তো কিনোর সবচেয়ে কাছের লোক। সন্ধেবেলা যখন সূর্য স্পেনের পর্বতমালার আড়ালে গা-ঢাকা দিল, তারপর ডুবে গেল দূর-সমুদ্রের বুকে, তখন কিনো উবু হয়ে ঢুকল কুঁড়েঘরে, ওর পাশে জুয়ানা। অমনি প্রতিবেশীতে ভরে গেল ঘর। কিনোর হাতে বিরাট মুক্তাটা তখনও জীবন্ত আর উষ্ণ। সেই মুক্তার মূর্ছনা মিশে গেছে সংসারের গানের সঙ্গে। একটি অন্যটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। প্রতিবেশীরা চেয়ে চেয়ে দ্যাখে আর ভাবে : এত সৌভাগ্য কোত্থেকে এল এই মানুষের কাছে!

জুয়ান টমাস বসে ছিল ওর ডানপাশে। জিজ্ঞেস করল, 'বড়লোক তো হয়েছ! এবার কী করবে?'

কিনো মণিটার দিকে তাকায়। জুয়ানা চোখ নামিয়ে শাল দিয়ে মুখ ঢেকে নেয় ভালো করে, যাতে চোখের উত্তেজনা কেউ দেখতে না-পায়। মুক্তা থেকে বিচ্ছুরিত আলো যেন বুক ভেদ করে ঢুকে পড়ছে কিনোর হৃদয়ে। নানারকমের ছবি আঁকা হচ্ছে সেখানে। এসব ছবি চিরদিন এঁকেছে সে আর মুছে দিয়েছে অসম্ভব বলে। এই মুহূর্তে মুক্তার দিকে তাকিয়ে যে-ছবি দেখতে পাচ্ছে, তা মোটামুটি এইরকম।

গির্জার উঁচু বেদিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাশে জুয়ানা, জুয়ানার কোলে কয়োটিটো। সামনে পুরোহিত দাঁড়িয়ে। কিনো আর জুয়ানার বিয়ে পড়াচ্ছেন। এখন টাকা হয়েছে কিনোর। বিয়ের খরচ মেটানোর সামর্থ্য হয়েছে। মৃদুস্বরে কিনো বলল, 'গির্জায় যাব, বিয়েটা সেরে ফেলব।'

কল্পনায় বিয়ের পোশাকটাও দেখতে পায় কিনো। জুয়ানার পরনে নতুন সদ্য পাটভাঙা স্কার্ট, নতুন শাল, পায়ে জুতো। মুক্তার পটে জ্বলজ্বল করে ওঠে স্বপ্নের ছবি। কিনো নিজে পরেছে নতুন, সাদা কাপড়। মাথায় নতুন টুপি—খড়ের নয়, মিহি

পশমের—তাতে অপরূপ লাগছে তাকে। চপ্পলের বদলে ফিতেঅলা জুতো পরেছে সে। সবচেয়ে চমৎকার দেখাচ্ছে কয়োটিটোকে। তার গায়ে আমেরিকা থেকে আনানো, নাবিকের নীল স্যুট। ছোট একটি ইয়টিং ক্যাপও আছে মাথায়। একবার মুক্তা-কুড়ানো দেখতে একদল বিদেশি পর্যটক এসেছিল প্রমোদতরীতে চড়ে। সে-তরীর নাবিকের পরনে অমন পোশাক দেখেছে কিনো। দেদীপ্যমান মুক্তার দিকে তাকিয়ে এসব ছবিও তার দেখা হয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, 'কিছু নতুন কাপড়ও কিনতে হবে।'

তারপর মুক্তার গান রূপান্তরিত হল ট্র্যাম্পেটের ঐকতানে; সে-সংগীত কিনোর কানে বাজতে লাগল।

হঠাৎ বছরখানেক আগে হারিয়ে যাওয়া হারপুনটার কথা মনে পড়ে। একটা হারপুন কিনতে হবে। তারপর হঠাৎ নতুন ভাবনা লাফিয়ে ওঠে মাথায়। ধনী হয়ে গেছে সে। এখন হারপুন কেন, একটা রাইফেল কিনলেই-বা ক্ষতি কী! মুক্তার জ্যোতি ওর বুকে রচনা করে আরও অনেক ছবি। নিজেকে বীরের বেশে দেখতে পায়। তার হাতে একটা উইনচেস্টার কারবাইন। হয়তো নিজের অজান্তেই কেঁপে ওঠে তার ঠোঁট। 'রাইফেল—একটা রাইফেল কিনলে কেমন হয়'?

রাইফেলই তার স্বপ্নের বাঁধ ভেঙে দেয়। এক অসম্ভব থেকে অন্য অসম্ভবের দিকে ছুটে চলে মন। লোকে বলে, মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। একটি পেলে অন্য একটি চেয়ে বসে। এ-ই হচ্ছে তাবৎ প্রাণীকুলের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিভা। অন্য প্রাণীদের মতো যা পেয়েছে সেইটুকুতে খুশি থাকতে পারে না বলেই তো মানুষ তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পেরেছে।

বাড়ির ভিতর ভিড় বাড়ে। কিনোর মাতাল স্বপ্নের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মাথা দোলায় সবাই। দূরে কে যেন অন্যকে বলে ওঠে, 'রাইফেল কিনবে। রাইফেল।...'

কিনোর মনে মুক্তার সংগীত তখনও বাজছে বিজয়োল্লাসের সঙ্গে। জুয়ানা চোখ মেলে তাকাল তার দিকে, যেন এক অসমসাহসী বীরের দিকে তাকিয়েছে। কিনোর শরীরে-মনে বিজলির পরাক্রম। স্বপ্ন দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়। সে দেখতে পায় কয়োটিটো স্কুলে পড়াশোনা করছে। জ্যাকেট তার পরনে, কলার সাদা। গলায় ঝুলছে চওড়া সিল্কের টাই। বড় এক কাগজে লিখছে সে। কিনো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রতিবেশীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ছেলে স্কুলে যাবে।' জনতার মধ্যে নীরবতা নেমে আসে। জুয়ানার মনে হচ্ছে, ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোলে ঘুমিয়ে আছে কয়োটিটো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবে পেল না জুয়ানা, এ-স্বপ্ন কি সত্যি হবে?

কিনোর মুখ স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : 'আমার ছেলে পড়বে, বই নাড়াচাড়া করবে। আমার ছেলে লিখবে, লেখা শিখবে। আঁক কষবে। এতে আমরা বাঁচতে পারব। কারণ সে জ্ঞানী হবে। আর ওর কাছ থেকে আমরা শিখব।' কিনো মানসচক্ষে দেখতে পায়, কুঁড়েঘরে আগুনের সামনে বসে আছে জুয়ানা আর সে।

কয়োটিটো একটি মস্ত বই পড়ছে। কিনো বলল, 'এই মুক্তা থেকে এইসব হবে আমাদের।' স্বল্পভাষী কিনো জীবনে কখনও এতকথা একসঙ্গে বলেনি। হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্তের মতো চুপ করল সে; সভয়ে বন্ধ করল হাতের মুঠো।

প্রতিবেশীদের বুঝতে আর বাকি নেই, তারা এক ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। বছরের-পর-বছর এই মুহূর্তটি নিয়ে গল্প জমবে। কত কথা হবে! তারা সবাই এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা জাহির করবে এইভাবে : 'আরে, নিজের চোখেই তো দেখলাম, মুহূর্তের মধ্যে লোকটা কীভাবে বদলে গেল! তার ভিতরে যেন নতুন ঐশী শক্তি যোগ হয়েছে। আর যে বিখ্যাত মানুষটির কথা হচ্ছে, তার নতুন জীবনের শুরু হয়েছিল এভাবেই...'

আর যদি কিছুই না-হয়, কিনোর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, তবে ওই প্রতিবেশীরাই বলবে; 'দূর, দূর, শুরুতে ভাবলাম কী না কী! তারপর দেখি সব পাগলামো। বোকার মতো উদ্ভট কথাবার্তা শুরু করেছিল লোকটা। ঈশ্বর না-করুন, আমাদের যেন অমন না-হয়। ঈশ্বর কিনোকে শাস্তি দিয়েছেন। এই হচ্ছে বিদ্রোহের শাস্তি। বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল কিনো। দেখতেই তো পেলে, কী হাল হল তার! নিজের চোখে দেখেছি কেমন পাগল হয়ে উঠেছিল!'

কিনো নিজের বন্ধ-করা মুঠোর দিকে তাকায়। গিঁটের যে-জায়গাগুলো দিয়ে ডাক্তারের গেটে ঘা দিয়েছিল, সেসব জায়গায় ঘা হয়ে গেছে, শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে।

বাইরে সন্ধে ঘনায়। জুয়ানা শালটা কাঁধের সঙ্গে বেঁধে নিল। ওর নিতম্বের কাছে ঝুলতে লাগল বাচ্চা। চুলোর কাছে গিয়ে ছাইয়ের নিচে থেকে বার করল কয়লা। কয়েকটা খড়ির টুকরো তার উপর ছড়িয়ে আগুন ধরাল। প্রতিবেশীদের মুখের ওপর শিখা দুলতে লাগল। তাদেরও বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। রাতের খাওয়া সারতে হবে। কিন্তু ইচ্ছে করছে না কারুর।

আরও কিছুক্ষণ পর যখন ভালো করে অন্ধকার ঘনিয়েছে, তখন লোকের মুখে ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়ে; 'ফাদার আসছেন—পুরোহিত আসছেন।' পুরুষেরা টুপি খুলে মাথা নোয়ায়। নারীরা শালে ভালো করে ঢেকে নেয় মুখ, চোখ নামায়। কিনো আর তার ভাই জুয়ান টমাস উঠে দাঁড়াল।

পুরোহিত ভিতরে এলেন। অনেক বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। মাথায় চুল সাদা, চামড়া কুঁচকে গেছে। কিন্তু চোখে এখনও তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য। অন্য সবাইকে তিনি শিশু জ্ঞান করেন। ছেলেপিলের মতোই দেখেন তাদের।

মৃদুস্বরে পুরোহিত বললেন, 'কিনো, তোমার নাম রাখা হয়েছিল এক মহান ব্যক্তির নামে। তিনি এই গির্জার মহান ফাদার ছিলেন।' গির্জার ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার মতো করে কথা বলছেন তিনি। 'যাঁর নামে তোমার নাম, তিনি পোষ মানিয়েছেন মরুভূমিকে আর তোমার প্রতিবেশীদের অন্তরে দিয়েছেন সুধা। তুমি কি তা অবগত আছ? একথা কেতাবে লেখা আছে।'

কিনো তার সন্তানের দিকে তাকায়। জুয়ানার নিতম্বে ঝুলছে বাচ্চাটা। কিনো

মাঝে মাঝেই ভাবে কবে সে বড় হবে, আর জানবে, কেতাবে কী লেখা আছে আর কী নেই। সকালবেলার সেই সংগীতের মূর্ছনা মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে আবার ফিরে আসছে ধীরে ধীরে, সূক্ষ্মভাবে। সেই অপদেবতা আর চিরবৈরীর সংগীত। প্রতিবেশীদের দিকে তাকায় কিনো। ভাবে, কে এনেছে ওই গান?

পুরোহিত আবার বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি, তুমি এক মহাসৌভাগ্য অর্জন করেছ। প্রকাণ্ড মুক্তা পেয়েছ।'

কিনো হাতের মুঠো খুলে দেখাল। পুরোহিত মুক্তার আকার আর সৌন্দর্য দেখে আঁতকে ওঠেন। তারপর বলেন, 'যিনি এই নেয়ামত তোমাকে দিয়েছেন, তাঁকে শুকরিয়া জানাতে ভুলো না, বাছা। ভবিষ্যতের জন্যেও তাঁর পথনির্দেশ চাও।'

কিনো নীরবে মাথা দোলাল। অস্ফুটস্বরে জুয়ানা বলল, 'চাইব, ফাদার। আমরা বিয়েটাও সেরে ফেলব। কিনো বলছিল।' সমর্থনের আশায় প্রতিবেশীদের দিকে তাকায় জুয়ানা। সবাই মাথা নাড়ে।

পুরোহিত বললেন, 'বড় ভালো লাগল, বাছারা। প্রথমেই ঐশী ভাবনা ভেবেছ। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন তিনি। প্রতিবেশীরা সরে গিয়ে পথ করে দিল।

কিন্তু কিনো আবার শক্ত করে আঁকড়ে ধরল মুক্তা। মনের মাঝে শুক্তিবীজের গান ছাপিয়ে অমঙ্গল আর অপদেবতার গান বেজে উঠছে। সন্দেহ-ভরা চোখে তাকিয়ে রইল সে।

একে একে বাড়ি ফিরল প্রতিবেশীরা। জুয়ানা চুলোর সামনে বসে মাটির হাঁড়িতে মটরদানা সেদ্ধ করার কাজটা শেষ করল। কিনো দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বাইরে তাকায়। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসছে নানান খাবারের ঘ্রাণ, ধোঁয়ার গন্ধ। আকাশের তারাগুলো ঝাপসা। রাতের বাতাস স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। নাকের উপর হাত চাপা দেয় সে। কুকুরটা তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। কিনো নিচের দিকে তাকিয়ে ওকে দেখতে পায় না। তার দৃষ্টি খাঁ-খাঁ দিগন্ত ভেদ করে চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। বড় একা লাগছে। শীতের রাতের বুক চিরে ডাকে ঝিঁঝি, ব্যাঙের একটানা ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ভেসে আসে। সবই যেন অমঙ্গলের সংগীত। কিনো একটু কেঁপে ওঠে। মুক্তাটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। মনে হয়, ওটা তারই একটা অঙ্গ, হাতের তালুর সঙ্গে লাগা।

পেছনে জুয়ানা রুটি সেঁকছে, শব্দ পায় কিনো। সে একধরনের উত্তাপ অনুভব করে—নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসে। পরিবারটা তার পেছনে আছে। পরিবারের গান ওর কানে বেজে ওঠে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে গিয়ে সেই গান যেন নতুন করে রচনা করেছে সে। মনে হয়, পরিকল্পনাও আশপাশের আর দশটা বস্তুর মতোই। একবার গড়া হলেই থেকে যায়, কখনও ধ্বংস হয় না। শুধু একটাই অসুবিধা, সদা-বিপন্ন থাকে জিনিসটা। কখন, কোন্‌দিক থেকে আঘাত আসবে, কে জানে? এখানে কিনোর স্বপ্ন জমাট বাঁধতে যখন বাস্তবের চেহারা নিয়ে দাঁড়াল, মনে

হল, সে-স্বপ্নকে চুরমার করার জন্যে শত্রুপক্ষ তৈরি হচ্ছে। আর দেবতারা যে মানুষের পরিকল্পনা পছন্দ করেন না, তা তো কিনোর জানাই আছে! দেবতারা শুধু দৈব ঘটনা ছাড়া মানুষের অন্য কোনো সাফল্যও চান না। কিনোর বুঝতে বাকি নেই, কোনো মানুষ যদি নিজের চেষ্টায় সফল হয়, তো দেবতারা তার ওপর নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। কিনো ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে স্বপ্নের জন্যে। কিন্তু স্বপ্ন রচনা হয়ে গেছে। তাকে ধ্বংস করার তো কোনো উপায় নেই। আসন্ন, অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের জন্য মনে-মনে তৈরি হল কিনো।

দরজায় দাঁড়িয়ে সে দ্যাখে, দুজন লোক বাসায় ঢুকছে। একজনের হাতে লণ্ঠন, মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে আলো। লোকগুলোর পা দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই তাদের চিনতে পারল কিনো। ডাক্তার সাহেব আর তাঁর ভৃত্য, যে গেট খুলেছিল। কিনোর হাতের ফাটা তোবড়ানো গাঁটগুলো জ্বালা করে ওঠে।

ডাক্তার বললেন, 'আরে, তুমি নাকি আমার ওখানে গিয়েছিলে! আমি তো বাসায় ছিলাম না। সুযোগ পেয়েই দেখতে এসেছি তোমার বাচ্চাকে।'

কিনো দাঁড়িয়ে থাকল দরজা আড়াল করে। দুচোখে ফেটে পড়ছে ঘৃণা। একটু একটু ভয়ও হচ্ছে। এ হচ্ছে শত শত বছরের বশ্যতার অভিশাপ। কিনো সংক্ষেপে বলল, 'বাচ্চা এখন বেশ ভালো।'

ডাক্তার হাসলেন, কিন্তু দোলনার দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেল। বললেন, 'ভাই রে, বিছার কামড় খুব অদ্ভুত। হঠাৎ মনে হবে, রোগী ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ বিনা নোটিশে... ওরেব্বাপ!' মুখভঙ্গিতে ত্বরিত বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করে দোলনার দিকে এগিয়ে যান ডাক্তার। আলোর দিকে ফিরিয়ে এমনভাবে ডাক্তারি ব্যাগটা খোলেন, যাতে যন্ত্রপাতি দেখা যায়। তিনি জানেন কিনোদের মতো লোকজন যে-কোনো কলাকুশলের সরঞ্জাম দেখতে ভালোবাসে, ওদের আস্থা জন্মায়। তিনি সহজ সুরে বলে চললেন, 'কত কী-ই যে হয়! হয়তো একটা পা-ই বরবাদ হয়ে গেল! চোখ কানা হয়ে যায়, পিঠ কুঁজো হয়ে যায়। তবে কিনা আমি হচ্ছি এই চিকিৎসার ওস্তাদ। ঘাবড়িয়ো না, দোস্ত। ঠিক করে দেব সব।'

কিনোর রাগ আর ঘৃণা গলে বেরিয়ে গেল যেন। তার জায়গায় এল ভয়। সত্যিকার ভয়। সে তো এসব বিপদের কিছু জানে না। হয়তো এই লোক জানে। এর জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিজের অজ্ঞতাকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর কথা ভাবতে পারছে না কিনো। সে ফাঁদে আটকেছে। ওরা সবসময়ই এভাবে ফাঁদে আটকে যায়। যতদিন-না কেতাবে কী লেখা আছে, না-আছে, জানতে পারবে ততদিনই ফাঁসবে। কিন্তু এখন কয়োটিটোর যা অবস্থা, তাতে ঝুঁকি নেওয়া চলে না। সরে দাঁড়াল কিনো, ওদের ঢুকতে দিল।

ডাক্তারকে দেখেই চুলোর কাছ থেকে সরে এসে দোলনার কাছে দাঁড়াল জুয়ানা। শালের কোণা দিয়ে বাচ্চার মুখ ঢেকে দিল। ডাক্তার যখন তার কাছে এসে হাত বাড়াল, তখন বাচ্চাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল জুয়ানা, তাকাল কিনোর দিকে। কিনো দাঁড়িয়ে আছে চুলোর কাছে। আগুনের প্রতিবিম্ব লকলক করে নাচছে ওর মুখে।

কিনো মাথা নাড়ালে জুয়ানা ছেড়ে দিল বাচ্চাকে। ডাক্তার তাকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'আলোটা ধরো।' ভৃত্য আলো উঁচু করে ধরল। ডাক্তার কয়োটিটোর কাঁধের ফোলা জায়গাটা পরীক্ষা করেন। তারপর চোখের পাতা উলটে দেখেন মণি। মাথা দোলান গম্ভীরভাবে। কয়োটিটো তখন সমানে হাত-পা ছুড়ছে।

তিনি বললেন, 'যা ভেবেছিলাম! বিষ ভিতরে ঢুকে গেছে। শিগগিরই ঘা দেবে। এই দ্যাখো!' চোখের পাতা টেনে ধরলেন ডাক্তার সাহেব। 'দেখতে পাচ্ছ? নীল হয়ে গেছে।' কিনোর মনে হল, সত্যি নীল হয়ে উঠেছে জায়গাটা। মনে পড়ল না, ওই জায়গা আগেও একটু একটু নীলাভ ছিল কি না। কিন্তু ফাঁদে তো পড়েছেই সে! এখন আর ঝুঁকি নেবার সময় নেই।

কোটরের ভিতর ডাক্তারের চোখ ভিজে উঠল। 'একটু ওষুধ দিয়ে দেখি, বিষ তাড়ানো যায় কি না।' বাচ্চাকে কিনোর কোলে তুলে দেন ডাক্তার।

তারপর তিনি ব্যাগের ভিতর থেকে বার করেন সাদা পাউডারের ছোট বোতল আর একটা সিরিশ আঠার ক্যাপসুল। ক্যাপসুলে পাউডার ভরলেন। এর চারদিক দিয়ে জুড়ে দিলেন অন্য একটা ক্যাপসুল, মুখ বন্ধ করলেন। তারপর দক্ষতার সঙ্গে বাকি কাজ শেষ করলেন। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে তার নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে কেটে মুখ খোলালেন। আঙুল দিয়ে ক্যাপসুল গুঁজে দিলেন বাচ্চার মুখের অনেকটা ভিতরে। মেঝের কলস থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে খাওয়ালেন। তার চোখের তারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন চিন্তিত দৃষ্টিতে।

. সবশেষে বাচ্চা ফিরিয়ে দিলেন জুয়ানার কোলে। কিনোর দিকে ফিরে বললেন, 'মনে হচ্ছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিষ আঘাত হানবে। ওষুধটা হয়তো সে-আঘাত সামলাতে সাহায্য করবে। তবু আমি একবার আসব ঘণ্টাখানেক পর। বাচ্চাটার জীবন বাঁচানোর জন্যেই বুঝি সময়মতো এসে পড়েছি আমি।' লম্বা শ্বাস নিলেন ডাক্তার, তারপর বেরিয়ে গেলেন কুঁড়েঘর থেকে। লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভৃত্য তার পিছু পিছু চলল।

জুয়ানা বাচ্চাকে আবার তার শালের ভিতর টেনে নেয়, তাকিয়ে থাকে বাচ্চার মুখের দিকে। দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে উদ্বেগ আর আশঙ্কা। কিনো কাছে এগিয়ে এল। বাচ্চার দিকে তাকাল। চোখের পাতা সরিয়ে মণিটা দেখার জন্য হাত তুলতেই হঠাৎ মনে হল, মুক্তা এখনও হাতে আঁকড়ে রেখেছে। দেয়ালে ঝোলানো একটা বাক্সের ভিতর থেকে একখণ্ড কাপড় বার করে আনল সে। তাতে মুড়িয়ে, মাটির মেঝে খুঁড়ে গর্তের ভিতর লুকিয়ে রাখল মুক্তাটা। চুলোর কাছে গিয়ে জুয়ানার পাশে বসল। জুয়ানা তখনও উবু হয়ে বসে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাচ্চার দিকে।

ডাক্তার সাহেব ফিরে গেলেন বাড়িতে। চেয়ারে আয়েশ করে বসে ঘড়ি দেখলেন। লোকজন রাতের খানা নিয়ে এল। সংক্ষিপ্ত খাবার—চকোলেট, মিষ্টি কেক আর ফল। বেজার মুখে তিনি খাবারের দিকে তাকান।

প্রতিবেশী মহলে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছিল কিনোর মুক্তা নিয়ে। কিন্তু এই প্রথম একটা কথা উঠল। এরপর কী হবে? তারা একে অন্যকে মুক্তার আকার দেখায় আঙুলের বিভঙ্গে, আর দেখতে যে কী সুন্দর, বোঝানোর জন্যে নানান শব্দ করে আদুরে গলায়। সত্যি একটা আকর্ষক ঘটনা ঘটল, যাহোক। এবার দেখা যাবে ধনীরা অন্য সব গরিব মানুষদের দিক থেকে যেমন মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিনোকেও তেমন অবজ্ঞা করে কি না। ডাক্তার কেন কিনোর বাড়িতে এসেছে, তা জানতে তো আর কারুর বাকি নেই। ডাক্তারকে হাড়ে হাড়ে চেনে সবাই, বেজায় কপট সে।

অনেক দূরে, সমুদ্রের মুক্তাপ্রধান এলাকায় তখন অন্য খেলা। ছোট মাছেরা জমাট ঝাঁক বেঁধে পানি ভেঙে ছুটছে জীবন বাঁচানোর জন্য। জেলেদের কুটিরগুলো থেকেও শোনা যায় শোঁ-শোঁ শব্দ। তাদের খাওয়ার জন্য তাড়া করছে বড়মাছগুলো। ছলাচ্ছল শব্দে মাঝে মাঝে লাফিয়ে ওঠে তারা। সাগর থেকে বয়ে আসে স্যাঁতসেঁতে বাতাস। ঝোপঝাড় আর ছোট ছোট গাছের উপর লোনা জলবিন্দু জমে ওঠে। মাটিতে চরে বেড়ায় রাতের ইঁদুর; নিশিজাগা বাজপাখি নিঃশব্দে তাদের শিকার করে নিয়ে যায়।

লোমওঠা কালো কুকুরটা কিনোর দরজার কাছে এসে ভেতরের দিকে তাকাল। কিনো যখন তার দিকে চাইল, তখন এমনভাবে লেজ নাড়ল যেন আর একটু হলেই পেছনের অংশ খসে পড়ে যেত। কিনো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেই শান্ত হয়ে গেল আবার। ঘরে ঢুকল না; দরজায় দাঁড়িয়ে দুর্বার আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে কিনোর খাওয়া দেখল। মাটির সানকিতে মটরশুঁটি খাওয়া শেষ করে রুটি দিয়ে ঝোল মুছে খেয়ে নিল কিনো। তারপর ওই সানকিতেই ঢেলে নিল ঘরে-গাঁজানো পুলকে। মদ খাওয়া হল, সানকি ধোয়ার কাজটাও সারা গেল।

রাতের খাওয়া শেষ করে একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরাতে যাচ্ছিল কিনো।

এমন সময় তীক্ষ্ণস্বরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে জুয়ানা। কিনো কাছে ছুটে গিয়ে দেখে, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার চোখ। নিচের দিকে তাকায় কিনো। ঝাপসা আলোয় ভালো করে দেখা যাচ্ছে না কিছু। লাথি দিয়ে চুলোর গর্তে কয়েকটা শুকনো ডালপালা ঢুকিয়ে দিল। আগুন বাড়ল। তখন দেখা গেল কয়োটিটোর মুখ। মুখটা সাদা হয়ে গেছে। ঘড় ঘড় করে শব্দ হচ্ছে গলার ভিতর। ঠোঁটের কোণা থেকে বেরিয়ে আসছে গাঢ় লালা।

কিনো বউয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। বিড়বিড় করে বলে, 'ডাক্তার ঠিকই জানত, এমন হবে।' জুয়ানা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দোলাতে শুরু করে, গুনগুন করে মন্ত্র আওড়ায়; ভাবে, সব আপদ-বালাই দূর হয়ে যাবে। বাচ্চা তখন অনবরত বমি করছে আর মায়ের কোলের ভিতর মোচড়াচ্ছে তার ছোট্ট শরীর। কিনো অস্থির হয়ে উঠল। মাথার ভিতর প্রচণ্ড ঝংকার তুলেছে অমঙ্গলের গান, সে-শব্দ ঢেকে দিয়েছে জুয়ানার মন্ত্রসংগীত।

ডাক্তার সাহেবের চকোলেট পান শেষ হল। মিষ্টি কেকের ছড়ানো টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে খেলেন। ন্যাপকিনে মুছলেন আঙুলগুলো, ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর উঠে পড়লেন ব্যাগ হাতে নিয়ে। বাচ্চাটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে—এই খবর বস্তির মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। গরিব মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু খিদে, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরেই অসুখের স্থান। কে যেন অস্ফুটস্বরে বলল, 'দেখলে তো, সৌভাগ্যের পায়ে পায়ে কিছু দুর্ভাগ্যও জড়িয়ে আসে।' অন্যরা মাথা দুলিয়ে সায় দিল। সবাই উঠে এগিয়ে এল কিনোর ঘরের দিকে। দরজার কাছে আবার ভিড় জমে ওঠে। নাক পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। আনন্দের মুহূর্তে এমন বিষাদ নেমে আসবে, ভাবাই যায় না। কেউ বিশেষ কোনো মন্তব্য করল না। বয়স্ক মানুষেরা সান্ত্বনা দিল, 'কী আর করবে, সবই তো আল্লাহর হাতে'!

এমন সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন ডাক্তার সাহেব, পিছন পিছন এসে ঢুকল তাঁর সঙ্গী। মুরগি তাড়ানোর মতো করে ভিড় সরিয়ে চলে এলেন জুয়ানার কাছে। বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মাথা পরীক্ষা করলেন। বললেন, 'বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে ঘায়েল করতে পারব, আশা রাখি। চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখব না।' পানি চাইলেন ডাক্তার সাহেব। এক কাপ পানির ভিতর তিন ফোঁটা অ্যামোনিয়া ঢাললেন। বাচ্চার মুখ ফাঁক করে ঢেলে দিলেন সেটা। এই চিকিৎসায় শিশুটি মহাআপত্তি প্রকাশ করল। ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে থুতু ছিটাতে লাগল। জুয়ানা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ করল সব। কাজ করতে করতে ডাক্তার কতকটা আপনমনে বললেন, 'ভাগ্যিস বিছা দংশনের চিকিৎসাটা জানতাম। নইলে...' নইলে কী হত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

কিন্তু তাতে কিনোর সন্দেহ কাটে না। ডাক্তার সাহেবের মুখ-খোলা ব্যাগের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরায়নি সে। সাদা পাউডারের বোতলটাও দেখতে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ডাক্তারের হাতে নেতিয়ে পড়ে থাকল বাচ্চাটা, ব্যথা কমে গেছে। বমি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বেচারা। টানা টানা নিশ্বাস ফেলে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

জুয়ানার কোলে ছেলেকে তুলে দিলেন ডাক্তার সাহেব। 'এবার ভালো হয়ে যাবে। লড়াইয়ে জিতে গেলাম।' জুয়ানা স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকায় তাঁর দিকে।

ডাক্তার সাহেব ব্যাগ বন্ধ করতে করতে সদয়কণ্ঠে বললেন, 'খরচাটা কবে দিতে পারবে, বলো তো?'

'মুক্তাটা বেচতে পারলেই আপনার টাকা দিয়ে দেব', বলল কিনো।

ডাক্তার সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'মুক্তা পেয়েছ? বড় মুক্তা?'

প্রতিবেশীরা সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বড় মানে! পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মুক্তা পেয়েছে কিনো। এই এতবড়।' হাতের তালু আর আঙুলের মুদ্রা তৈরি করে দেখায় তারা।

'কিনো তো বড়লোক হয়ে গেছে। এতবড় মুক্তা কেউ কখনও চোখে দেখেনি।'

ডাক্তার সাহেবকে বিস্মিত দেখায়। 'কই, আমি তো শুনিনি! তা মুক্তাটা

নিরাপদ জায়গায় রেখেছ তো? আমার কাছে রাখতে পারো। আমার সিন্দুকে নিরাপদে থাকবে।'

কিনোর চোখে যেন ক্রুদ্ধা সাপিনী ফণা তোলে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। 'নিরাপদেই রেখেছি। কাল বিক্রি করে আপনার পাওনা শোধ করব।'

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকালেন। কিনোর চোখ থেকে দৃষ্টি সরালেন না। তিনি জানেন, বাড়ির কোথাও পুঁতে রাখা হয়েছে জিনিসটা, আর কিনো আড়চোখে হলেও একবার সেদিকে তাকাবে। 'বিক্রি করতে পারার আগেই যদি চুরি হয়ে যায় সেটা, খুবই লজ্জার কথা, তাই না?' হঠাৎ কিনো তাকিয়েছে ঘরের কোণের খুঁটির দিকে, ডাক্তার দেখে ফেললেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর আবার নীরবতা নেমে আসে কুটিরে। প্রতিবেশীরা অগত্যা পা বাড়াল যার যার ঘরের উদ্দেশে। কিনো আগুনের সামনে উবু হয়ে বসে রইল, কান পেতে শুনতে লাগল রাতের শব্দমালা, সমুদ্রতীরে আছড়ে-পড়া ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃদু কল্লোল। দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে। বাতাস শিরশির করে ওঠে কুটিরের খড়ো চালায়। প্রতিবেশীদের কথাবার্তা ভেসে আসে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে। ওরা কেউ সারারাত অঘোরে ঘুমায় না। মাঝে মাঝে জাগে, কথা বলে, আবার ঘুমায়। কিছুক্ষণ পর উঠে পড়ল কিনো। এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

বাতাসের গন্ধ নিল সে, কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করল কোনো অপরিচিত শব্দ পাওয়া যায় কি না। কোনো ফিসফিসানি কিংবা হামাগুড়ির শব্দ হচ্ছে না তো! অন্ধকারের ভিতর জ্বলে ওঠে তার সতর্ক চোখ। মাথায় সেই অমঙ্গলের আদিম বাদ্য বাজছে। রাগ হল ওর। ভয়ও পেল। খুঁটির পাশের গর্তটা আবার খুঁড়ল সে। মুক্তাটা বার করল। তারপর নিজের বিছানা তুলে নতুন করে গর্ত খুঁড়ে তার ভিতর লুকিয়ে রাখল।

আগুনের পাশে বসে সব লক্ষ করছিল জুয়ানা। 'এত ভয় পাচ্ছ কাকে, বলো তো?'

মনে মনে সত্যিকার উত্তর খুঁজল কিনো। অবশেষে বলল, 'সবাইকে।' হঠাৎ ওর মনে হল, শরীর শক্ত হয়ে উঠছে ঝিনুকের খোলার মতো।

কিছুক্ষণ পর ওরা শুয়ে পড়ে মাদুরের বিছানায়। জুয়ানা আজ বাচ্চাকে দোলনায় শোয়াল না। পাশে শুইয়ে হাত দিয়ে দোল দিতে লাগল, মাথা ঢেকে রাখল শাল দিয়ে। একসময় চুলোর শেষ জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিভে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

কিন্তু কিনোর মনের ভিতরটা নতুন জোছনায় ভেসে যায়। সে স্বপ্ন দ্যাখে, কয়োটিটো পড়তে শিখেছে। নিজেদের একজন, অন্তত একজন তাকে বলতে পারছে, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। কিনো স্বপ্ন দ্যাখে, প্রকাণ্ড একটা বই পড়ছে কয়োটিটো—বাড়ির সমান। তার ভিতরে অক্ষরগুলো সব এক-একটা কুকুরের মতো; বইয়ের ভিতর নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর পৃষ্ঠাটা যেন অন্ধকারে ঢেকে যায়। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসে। অমঙ্গলের গান। ঘুমের মধ্যে নড়ে

ওঠে কিনোর শরীর। তার শরীরের আন্দোলন অনুভব করে জুয়ানা চোখ মেলে তাকায় অন্ধকারের ভিতর। কিনোর ঘুম ভেঙে যায়। অমঙ্গল সংগীত শুনতে শুনতে কান খাড়া করে সে।

এরপর ঘরের কোণ থেকে অস্পষ্ট শব্দ আসে। এত ক্ষীণ যে মনে হয় সেটা ওদের নিশ্বাসেরই শব্দ। সামান্য নড়াচড়া, মাটির উপর পা ফেলার শব্দ। শোনা যায় কি না, এইরকম। উৎকর্ণ হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে কিনো। কিছুক্ষণের জন্য সব নীরব, নিথর হয়ে যায়। কিনোর মনে হল, আসলে সবই বুঝি মনের ভুল। কিন্তু জুয়ানার হাত অন্ধকারের মধ্যে যখন তার শরীর আঁকড়ে ধরে, তখন সতর্কতা-সংকেত শুরু করে মাথার ভিতর। আবার শুরু হয়েছে শব্দটা। মাটির উপর পা-ঘসানির শব্দ, আঙুলের আঁচড়ের শব্দ।

কিনোর বুকে বুনো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কের পিছন পিছন আসে আক্রোশ, সবসময়ই যেমন হয়। জামার ভিতরে লুকানো ছুরিটা বার করে ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিনো। অন্ধকারের মধ্যেই ছুটে গেল ঘরের কোণে। আরও গাঢ় অন্ধকারের বেশে কে-যেন দাঁড়িয়ে আছে। ছুরির আঘাত হানল কিনো। আবার। কাপড়ের স্পর্শ অনুভব করল। এরপর এল পাল্টা আঘাত। কিনোর মনে হল, মাথার ভিতর হঠাৎ বিদ্যুচ্চমক খেলে গেছে। যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছে। দরজায় ধাক্কার শব্দ হল। দ্রুত ধাবমান পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। আবার নেমে এল নীরবতা।

কিনো টের পেল, তার কপাল ফেটে উষ্ণ রক্ত নেমে আসছে। জুয়ানা আর্তনাদ করে উঠল, 'কিনো! কিনো!' বিষম ভয় পেয়েছে সে। যেমন দ্রুত রাগ উঠেছিল, তেমন করেই শীতলতা নামল মুহূর্তের মধ্যে। কিনো বলল, 'আমার কিছু হয়নি। ইয়ে পালিয়ে গেছে।'

ফিরে এসে মাদুরে শুয়ে পড়ল কিনো। জুয়ানা উঠে চুলোর কাছে এগিয়ে যায়। ছাই সরিয়ে আধ-নেভা অঙ্গার বার করে। খড়কুটো ফেলে আগুন জ্বালে। মাথা-ঢাকা শালের কোণা পানিতে ডুবিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে ফিরে আসে কিনোর কাছে। মুছে দেয় কপালের রক্ত। কিনো বলল, 'তেমন কিছু নয়।' কিন্তু তার স্বরে কাঠিন্য আর ঘৃণার উত্তাপ টের পেল জুয়ানা।

নতুন উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে জুয়ানার মনে। ঠোঁট শুকিয়ে পাতলা হয়ে যায়। 'জিনিসটা অশুভ', রুক্ষস্বরে বলল সে, 'এই মুক্তা আসলে এক পাপ! সর্বনাশ করবে আমাদের।' ধীরে ধীরে গলা চড়াল সে। 'কিনো, ছুড়ে ফেলে দাও ওটা। এক কাজ করি, চলো। পাথর দিয়ে ভেঙে নষ্ট করে ফেলি। কিংবা পুঁতে ফেলি মাটির নিচে, তারপর সব ভুলে যাই। না হলে সাগরে ছুড়ে ফেলে দিই। বাড়িতে শয়তান নিয়ে এসেছে ওই জিনিস। কিনো, লক্ষ্মী সোনা, আমার কথা শোনো। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের।' আগুনের মৃদু আলোয় দেখা গেল, ভয়ে সাদা হয়ে গেছে জুয়ানার চোখ আর ঠোঁট।

কিন্তু কিনোর মুখে গভীর প্রত্যয়ের ছাপ। 'একটাই সুযোগ এসেছে জীবনে। ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে হবে। অন্ধকার গুহা থেকে আমাদের আলোয় টেনে নিয়ে যাবে সে।'

জুয়ানা কেঁদে ফেলল। 'আমরা যে শেষ হয়ে যাব! এমনকি আমাদের ছেলেও!'

কিনো ফিসফিস করে বলল, 'শ্‌শ্‌! এত কথা বলিসনে। সকালেই বেচে দেব মুক্তা। শয়তান দূর হয়ে যাবে। তারপর যা থাকবে, সবই মঙ্গল। এখন চুপ করে থাক্, বউ।' মৃদু আলোয় হঠাৎ লক্ষ করে কিনো, ছুরিটা এখনও হাতে ধরা আছে। তাতে রক্তের দাগ। নিজের পরনের কাপড়ে মুছতে গিয়েও মত বদলায় সে। বিছানার নিচে, মাটিতে মুছে ফেলে ছুরিটা।

দূরে কোথাও মোরগ ডাক দিয়ে ওঠে। ফর্সা হয়ে আসে আকাশ। রাতের বাতাস বন্ধ হয়। দিন আসছে। নতুন দিন। ভোরের হাওয়া ঢেউ তোলে নদীর মোহনায়। শিরশির করে ওঠে গরানগাছের পাতা। ছোট ছোট ঢেউগুলো একটানা সংগীতের শব্দ তুলে উপলাকীর্ণ বালুবেলায় আছড়ে পড়ে। কিনো মাদুর তুলে গর্ত খোঁড়ে। বার করে আনে মুক্তাটা। হাতের মুঠোয় রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

অপরূপ, মনোলোভা মুক্তাটা মাথা খারাপ করে দিচ্ছে কিনোর। মৃদু, মায়াবী আলোয় হাসছে যেন পেলব মুক্তা। তার ভিতর থেকে উঠে আসছে নতুন সংগীত—নতুন অঙ্গীকার আর আনন্দের গান—ভবিষ্যতের স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। তার স্নিগ্ধ দীপ্তি আশ্বাস দিচ্ছে ব্যথা-বেদনার উপশমের; অপমানের বিরুদ্ধে দেয়াল গড়ে দেবার। ক্ষুধার দরজা বন্ধ করে দেবে এই মুক্তা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিনোর চোখের দৃষ্টি সহজ হয়ে আসে; শিথিল হয়ে আসে মুখের পেশি। কিনোর কানে আবার বেজে ওঠে সাগরতলের উদাত্ত গান, সবুজ ছায়ার দ্যোতনা। তার মুখে হাসি ফোটে। জুয়ানা তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে। কিনোর সব স্বপ্নে নিজের ভাগের কথা তার জানা আছে। সে-ও হেসে ফেলে।

আশায় আর আনন্দে আরও একটি দিনের শুরু হয় ওদের।

চার

ছোট শহর যে কীভাবে তার নিজের আর তার সব অলিগলির হদিস রাখে, ভেবে বিস্ময় লাগে। একটা বিশেষ এলাকার কথা ধরা যাক। যদি সেখানকার সব নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর একই রকম আচরণ করতে থাকে, কেউ নিয়মের বেড়া না-ভাঙে, কোনো বিরোধ না হয়, কোনো পরীক্ষামূলক পরিবর্তন না-ঘটানো হয়, শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন থাকে, এককথায় সব থাকে স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ, তবে একসময় হারিয়ে যাবে ওই এলাকা, আর কখনও তার কথা শোনাই যাবে না। কিন্তু শুধু একটি মানুষকে প্রচলিত ধারণার বাইরে আসতে দিন, কিংবা ভাঙতে দিন জানাশোনা, প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। পুরো শহর থরথর করে কাঁপতে থাকবে। শহরবাসীর স্নায়ু থেকে

স্নায়ুতে ছুটবে খবর, এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত জানাজানি হয়ে যাবে। কোনো এলাকাই আর বাকি থাকবে না, খবর ছড়িয়ে পড়বে সবখানে।

তো, এইভাবে গোটা লা পাজ শহরে সবাই ভোরবেলাতেই জেনে গেল, কিনো ওইদিন তার মুক্তা বেচবে। কুঁড়েঘরের প্রতিবেশীরা জানল, মুক্তাশিকারিরা জানল। খবর গেল চিনে মুদি দোকানিদের কাছে, গির্জায় খবর ছড়িয়ে পড়ল। সন্ন্যাসিনীদেরও জানতে বাকি রইল না। ভিক্ষুকরা বলাবলি শুরু করল খবরটা। ওদের তো জানতেই হবে। যার কপাল খুলবে, সে কি ভিক্ষুকদের মোটা বকশিশ না-দিয়ে পারে? বাচ্চাদের মধ্যে মহা উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ল। তবে সবচেয়ে আলোড়ন দেখা গেল মুক্তাক্রেতাদের মহলে। সবাই সকাল সকাল দোকান খুলে বিশেষ ভঙ্গিতে বসে অপেক্ষায় রইল আর ভাবতে লাগল গোটা ঘটনায় তার নিজের ভূমিকার কথা।

ধরে নেওয়া হল, জেলেরা যে-মুক্তা বিক্রি করতে আসবে, তা কেনার জন্য ক্রেতারা দরদাম করবে যার যার মতো, একা। একসময় এভাবেই মুক্তা বেচাকেনা হত। ভালো একটা মুক্তার জন্য ভালো দাম হাঁকতে পারার মধ্যে একটা বড়মানুষি আছে। কিন্তু এখন ব্যাপারটাকে সেরেফ অপচয় ভাবা হয়। এখন দরদাম করে একজনই। অন্যেরা সবাই তার ক্রীড়নক। কিনোর অপেক্ষায় যারা বসে আছে, তাদের সবাই জানে, মুক্তার দাম প্রথমে কত হাঁকা হবে এবং শেষপর্যন্ত কত উঠবে। কম দামে কেনার জন্য কী কী বুদ্ধি প্রয়োগ করা হবে, তা-ও সবার জানা। অবশ্য দাম যা-ই উঠুক, বেতনভোগী ক্রেতাদের তাতে কোনো আর্থিক লাভ-ক্ষতি নেই। লাভ শুধু জিততে পারার আনন্দ। তাই মুক্তাক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শিকারে উত্তেজনা থাকেই। যে কমদামে কিনতে পারবে, তার আনন্দ আর আত্মতুষ্টির সীমা থাকবে না। কারণ পৃথিবীর সব মানুষই কিছু করার বেলায় মনোভাব যা-ই থাক, সবটুকু সামর্থ্য কাজে লাগায়। যতটা ভালোভাবে পারবে, তার চেয়ে কম করে না কেউ। মুক্তাক্রেতাদের বেলায়ও ওই একই কথা। পুরস্কার কী পাবে, না-পাবে, কিংবা মুখের প্রশংসাটুকুও জুটবে কি না, সে বিবেচনা করে না। মুক্তাক্রেতা মানেই মুক্তাক্রেতা। যে সবচেয়ে কম দামে কিনতে পারবে, সে-ই সেরা, সে-ই সবচেয়ে সুখী।

সূর্য তপ্ত, হলুদ হয়ে উঠল। মুক্তাশিকারিদের নৌকাগুলো তবু বাঁধা রইল সমুদ্রতীরে। আজ আর কেউ মুক্তা তুলতে যাবে না। আজ কত কী ঘটবে, কত কী দেখার আছে শহরে! আজ কিনো সেই বিখ্যাত মুক্তা বিক্রি করবে।

সমুদ্রতীরের কুটিরগুলোতে কিনোর প্রতিবেশীরা শেষ হবার পরও বসে আড্ডা দিচ্ছে। জল্পনা-কল্পনার বিষয়ই ওই মুক্তা। সবাই বলছে, মুক্তাটা পেলে কী করত। একজন বলে বসল, মুক্তাটা সে রোমের হলি ফাদারকে উপহার দিত। অন্য একজন বলল, তার হাজার বছরের যত পূর্বপুরুষ, তাদের সবার আত্মার মাগফেরাতের জন্যে গির্জায় শিরনি দিত। আর একজনের মনে হয়েছে, মুক্তাটা পেলে সে আগে বেশি

দামে বিক্রি করত, তারপর সব টাকা বিলিয়ে দিত লা পাজের গরিব-দুঃখীদের মধ্যে। চতুর্থজন জানে, টাকা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো ভালো কাজ হয় না। তাই মুক্তাটা পেলে সে আগে টাকা কামাই করবে, তারপর কত যে সেবা আর কল্যাণমূলক কাজ করবে, তার ঠিক নেই। তবে একটা ব্যাপারে সব প্রতিবেশীই একমত যে হঠাৎ বড়লোক হয়ে কিনোর মাথা গরম হয়ে যাবে না। শয়তান এসে তার কাঁধে ভর করবে না। লোভ, ঘৃণা আর অবজ্ঞা জন্মাবে না। কিনোকে বড্ড ভালোবাসে ওরা। মুক্তা যদি তার মাথা খায়, খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।

আজকের সকাল কিনো আর জুয়ানার জীবনে অনন্য একটি সকাল। এর সঙ্গে শুধু সেই দিনটির তুলনা চলে যেদিন কয়োটিটোর জন্ম হয়েছিল। এটি এমন একটি দিন যা জীবনের অন্য দিনগুলোকে চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করা যায়। এই যেমন কোনো-একদিন ওরা বলবে, 'মুক্তাটা বিক্রি করার দু-বছর আগের কথা...', কিংবা 'মুক্তাটা যেদিন বিক্রি করলাম, তার ছয় সপ্তাহ পরের কথা বলছি...।' এইসব বিষয় বিবেচনা করে জুয়ানা কয়োটিটোকে সুন্দর করে সাজাল। তার ব্যাপ্‌টিজমের জন্যে যেসব কাপড় তৈরি করে রেখেছিল, ভেবেছিল, হাতে টাকা এলে তখন আয়োজন করে ব্যাপ্‌টিজম্ করবে, সেগুলো পরাল। নিজে চুল আঁচড়ে সিঁথি করল। বিনুনি করে চুলের প্রান্ত বাঁধল একজোড়া লাল ফিতেয়। বিয়ের কাপড় বার করে পরল। সূর্য বেশ খানিকটা উপরে উঠলে বেরুনোর জন্য তৈরি হল তারা। কিনোর সাদা কাপড় জীর্ণ হয়ে গেছে, তবু ফরসা আছে, এই রক্ষে। আজই তো এইসব কাপড় পরার শেষদিন। আগামীকাল, কাল কেন, আজই বিকেলে নতুন কাপড় কিনতে পারবে সে।

প্রতিবেশীরা বেড়ার দেয়ালের ছিদ্রপথে তাকিয়ে আছে কিনোর বাড়ির দরজার দিকে। তারাও কাপড় পরে তৈরি হয়ে আছে। মুক্তা বেচতে কিনো আর জুয়ানার সঙ্গে যাবার কথা কেউ তাদের বলে দেয়নি। যেন তাদের যেতেই হবে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে, নইলে পাগল হয়ে যাবে তারা। না-যাওয়াটা মোটেই বন্ধুত্বের লক্ষণ নয়।

জুয়ানা তার মাথার শালটা কায়দা করে বাঁধল মাথায়, অন্যপ্রান্ত এমনভাবে কাঁধের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিল, যাতে শালের অর্ধেকটা দোলনার মতো ঝুলতে থাকে হাতের নিচে। কয়োটিটোকে সেখানে শুইয়ে দিল। ওর মুখটা এমনভাবে রাখল যেন বাইরের সবকিছু দেখতে পায়। হয়তো বাচ্চাটা সবই মনে রাখবে। কিনো তার খড়ের হ্যাট পরে নেয়। হাত দিয়ে দেখে নেয়, ঠিকমতো পরা হল কি না। অবিবাহিত, দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরাদের মতো পিছন কিংবা পাশ ঘুরিয়ে টুপি পরতে পারে না সে। আবার বুড়োদের মতো একেবারে সোজাসুজি পরাটাও কাজের কথা নয়। সে একটু বাঁকিয়ে, সামনে ঝুঁকিয়ে হ্যাট পরেছে, যাতে তাকে গম্ভীর, লড়াকু আর বলিষ্ঠ মনে হয়। হ্যাট পরার ভঙ্গির মধ্যে অনেককিছু দেখার আছে। কিনো স্যান্ডেলে পা গলিয়ে নিল ফিতে টেনে দিল গোড়ালির উপরে। মুক্তাটা মুড়ে নেওয়া

হয়েছে হরিণের নরম চামড়ায়। সেটা রাখা হয়েছে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগে, ব্যাগটা পকেটে পুরে নিয়েছে কিনো। চাদর বেশ কায়দা করে ভাঁজ করে বামকাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। এবার প্রস্তুত।

বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বাড়ির বাইরে পা বাড়াল, কিনো। জুয়ানা কয়োটিটোকে কোলে নিয়ে ওর পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করে। শহরমুখো গলিপথটা হাঁটুজলে ডুবে আছে। ওরা গলিতে এসে উঠতেই প্রতিবেশীরা যোগ দিল। বাড়িগুলো যেন ঢেঁকুর তুলছে, খলবল করে বেরিয়ে আসছে লোক। খিড়কিগুলো বমি করে বার করে দিচ্ছে ছেলেপিলে। কিন্তু ঘটনার গুরুগাম্ভীর্যের কারণে সবাই পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল, শুধু একজনই রইল কিনোর পাশে। সে কিনোর ভাই, জুয়ান টমাস।

জুয়ান টমাস ভাইকে সতর্ক করল। 'সাবধান থেকো, ওরা যেন তোমাকে ঠকাতে না-পারে।'

কিনো মাথা নাড়ে। 'খুব সাবধান থাকব।'

'অন্য সবখানে কেমন দাম পাওয়া যায় কে জানে?' জুয়ান টমাস বলল, 'ন্যায্য দাম কত হতে পারে? অন্যান্য জায়গায় জেলেরা কেমন দাম পায় তা-ও তো জানি না, কী বলো?'

কিনো বলল, 'কথা সত্য। কিন্তু আমাদের জানার উপায় কী? আমরা তো ওসব জায়গায় থাকি না, এখানে থাকি।'

ওরা যতই এগিয়ে চলল শহরের দিকে, পেছনের ভিড় বাড়ল তত। জুয়ান টমাসের নার্ভাসনেসও বাড়ল; অনর্গল কথা বলতে লাগল সে।

'বুঝলে, কিনো, তোমার জন্মের আগে বয়স্কলোকেরা এক বুদ্ধি বার করেছিল মুক্তার বেশি দাম পাবার। তারা ভাবল, মুক্তা রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার জন্য দালাল ঠিক করলেই তো হয়। বেশি দাম পাওয়া গেলে দু'তরফেরই লাভ। সবাই কিছু বাড়তি টাকা পাবে।'

কিনো মাথা নেড়ে বলল, 'জানি। বুদ্ধিটা মন্দ ছিল না।'

জুয়ান টমাস বলল, 'তা ওইরকম একজন লোক খুঁজে বার করল তারা। যে-যা মুক্তা পেল, সব দিল তার হাতে, তারপর রওনা করিয়ে দিল। তারপর কী হল, জানো তো, গায়েব হয়ে গেল ব্যাটা। মুক্তাগুলোও খোয়া গেল। এরপর অন্য একজনকে পাওয়া গেল। সে-ও মুক্তা নিয়ে সরে পড়ল, আর কোনোদিন ফিরে এল না। আর কত? ওই পথই বাদ দেওয়া হল। সবাই ফিরে গেল পুরনো নিয়মে।'

কিনো বলল, 'জানি। ফাদারের কাছে শুনেছি। ফাদার একেবারে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, অধর্মের কাজ করেছিল আমাদের লোকজন। তারা তাদের নির্দিষ্ট গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। ঈশ্বর মুক্তাগুলো কেড়ে নিয়ে আসলে তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। ফাদার তো সোজাসুজি বললেন, প্রত্যেক নারী আর পুরুষ ঈশ্বরের সৈনিক। আর এই পৃথিবী তাঁর দুর্গের মতোই। ঈশ্বর তাদের এই দুর্গের নির্দিষ্ট

জায়গা পাহারা দেবার জন্য পাঠান। কাউকে পাঠান উপরের চাতাল পাহারা দেবার দায়িত্ব দিয়ে, আবার কেউ পায় অন্ধকার দেয়ালের কোণা। কিন্তু কারুরই উচিত নয় নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে সরে যাওয়া। তাতে দুর্গের অকল্যাণ হয়, নরকের দিক থেকে বিপদ আসে।'

জুয়ান টমাস বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি। উনি তো বছর বছর এইসব নসিহত করেন।'

চলতে চলতে দুভাই-ই একটু আড়চোখে তাকাতে লাগল। এভাবেই চারশো বছর ধরে তাকিয়েছেন তাদের বাবা, দাদা, পরদাদা, সেই যখন প্রথম এল বিদেশিরা। তাদের ছিল নানান যুক্তি আর ক্ষমতার অস্ত্র, আর পিছনে ছিল কামান—সেগুলোকে পোক্ত করার জন্য। চারশো' বছর ধরে কিনোদের লোকজন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটাই নিয়ম শিখেছে। চোখ নামিয়ে নেওয়া, ঠোঁট শক্ত করে রাখা আর পিছু হটে যাওয়া। ব্যস্। এর চেয়ে ভালো প্রতিরোধের দেয়াল গড়ার কথা তারা ভাবতে পারে না। ওই দুর্গেই তারা সবচেয়ে নিরাপদ ভাবে নিজেদের।

মিছিলে একটা গুরুগম্ভীর ভাব দেখা যাচ্ছে। সবাই এই দিনের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে। ছেলেমেয়েরা গোলমাল করে উঠলেই বড়রা ফিসফিস করে সতর্ক করে দিচ্ছে। ব্যাপারটা এত গুরুত্ব পেয়েছে যে এক বৃদ্ধও মিছিল দেখতে এসেছেন ভাইপোর বলিষ্ঠ কাঁধে চেপে। কুঁড়েঘরগুলো ছাড়িয়ে মিছিল পৌঁছে গেল ইট-পাথরের শহরে। সেখানে রাস্তা একটু চওড়া, পাশ দিয়ে বাঁধানো ফুটপাত আছে। আগের মতোই, গির্জার সামনে দিয়ে যাবার সময় মিছিলে যোগ দিল ভিক্ষুকেরা। মুদি-দোকানিরা ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল। চায়ের দোকানের খরিদ্দাররা উঠে যোগ দিয়েছে মিছিলে। দোকানিরা আর কী করে, দোকান বন্ধ করে চলল মজা দেখতে। শহরের রাস্তায় রোদ উঠেছে। ছোট ছোট পাথরগুলোও মাটিতে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে।

মিছিলের আগে আগে ছুটল মিছিল আসার খবর। মুক্তাব্যবসায়ীরা টানটান হয়ে বসে রইল তাদের অফিসে। কাগজপত্র বার করে সামনে রাখল, যাতে কিনো ঢুকেই দেখতে পায় তারা কাজে খুবই ব্যস্ত। নিজেদের মুক্তাগুলো ডেস্কে লুকিয়ে রাখে তারা। কিনোর সুন্দর, অমূল্য মুক্তার পাশে তাদের মুক্তা খারাপ দেখাতে পারে, এই ভয়ে। মুক্তাব্যবসায়ীদের অফিসগুলো সব একটা সরু গলির ভিতর, গায়ে গায়ে লাগানো। জানালায় কাঠের পাল্লা দিয়ে বন্ধ করা আছে, যাতে ভিতরে বেশি আলো ঢুকতে না-পারে।

স্থির, শান্ত প্রকৃতির একজন লোক বসে অপেক্ষা করছে একটি অফিসে। তার মুখে ঋষিদের মতো শুভ্রতার ভাব আছে। সবাইকে সালাম দেয়, সজোরে করমর্দন করে। হাসিখুশি মানুষ, অনেক চুটকি জানে। তবু তার মুখে একটা চাপা বিষণ্নতা ছড়িয়ে থাকে। হাসতে হাসতে যেন হঠাৎ তার নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে, চোখ ভিজে যায় অন্যের দুঃখে। আজ সকালে সে তার টেবিলে ফুলদানিতে

একটি চমৎকার টুকটুকে লাল ফুল সাজিয়ে রেখেছে। তার পাশেই রেখেছে কালো মখমল কাপড়ে ঢাকা মুক্তার ট্রে। ভালোভাবে দাড়ি কামিয়েছে। মুখটা নীল দেখাচ্ছে তার। হাত দুটো ঝকঝকে পরিষ্কার, নখগুলো পালিশ-করা। দরজা খুলে রেখেছে সকালবেলাতেই। ডানহাতে হিসাবের খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে গুনগুন করছে সে, বামহাতে নাচাচ্ছে একটা মুদ্রা। মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। সবই চলছে যেন যান্ত্রিকভাবে। বাইরের রাস্তায় অনেক পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। খাতার পাতায় দ্রুততর হতে লাগল তার হাত, যতক্ষণ-না কিনো এসে দরজায় দাঁড়াল। বামহাতের মুদ্রা কোথায় ছিটকে পড়ল, কে জানে!

সালাম জানিয়ে শান্ত লোকটি বলল, 'তোমার জন্যে কী করতে পারি, ভাই?'

কিনো আবছা অন্ধকারে চারদিকে তাকায়। তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে বাইরের আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এসে। ক্রেতার চোখ কিন্তু ক্রমেই তীক্ষ্ণ, নির্দয় হয়ে উঠছে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। কিন্তু মুখের হাসিটি তখনও অম্লান। বামহাত আড়াল করে আর একটি মুদ্রা নিয়ে খেলা করতে লাগল সে।

কিনো বলল, 'একটা মুক্তা আছে।' এত সাদামাঠাভাবে বলাটা পছন্দ হল না জুয়ান টমাসের। মুখ কোঁচকাল সে। প্রতিবেশীরা দরজায় ভিড় করে উঁকি দিচ্ছে ভিতরে। ছোট ছেলেপিলের কেউ জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ কিনোর পায়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কারও কৌতূহলের শেষ নেই।

মুক্তাব্যবসায়ী বলল, 'একটা মুক্তা আছে! লোকে তো ডজন ডজন মুক্তা নিয়ে আসে। তা কই, দেখি তোমার মুক্তা। যাচাই করে দেখি। দাম ঠিকমতোই পাবে।' ডেস্কের আড়ালে তার বামহাত উন্মত্তের মতো নাচাচ্ছে মুদ্রাটা।

পরিস্থিতির নাটকীয়তা বেশ বুঝতে পারছে কিনো। ধীরে ধীরে সে চামড়ার ব্যাগটা বার করে আনল। খুলে ফেলল হরিণের চামড়ার ছোট মোড়ক। সেই মহামূল্য মুক্তা গড়িয়ে দিল ট্রের উপর। তারপর সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি চলে গেল ক্রেতার মুখের দিকে। অস্বাভাবিক শান্ত মুখ, কোনো পরিবর্তন নেই সেখানে। শুধু তার বামহাত থেকে কখন যেন ছিটকে সরে গেছে মুদ্রা। হাত মুঠ করে উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করছে সে। খাতার আড়াল থেকে ডানহাত বেরিয়ে এল। চার আঙুলে অবহেলার সঙ্গে তুলে ধরল মুক্তাটা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। চোখের কাছে তুলে আনল তারপর। আবার দেখল।

কিনো রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। প্রতিবেশীরাও যেন নিশ্বাস নিতে ভুলে গেছে। ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়ে ভিড়ের মধ্যে, 'দেখছে। এখনও দরদাম হয়নি।'

ততক্ষণে উত্তেজনা সামলে আরও ধীর-গম্ভীর হয়েছে মুক্তাব্যবসায়ী। ট্রের উপর ফেলে আঙুলের টোকা দিয়ে মুক্তাটাকে অপমান করল সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন অবজ্ঞার হাসি হাসল, যেন ইটের টুকরো পড়ে আছে সামনে।

'না, ভাই, চলবে না।'

কিনো বলল, 'অতি মূল্যবান মুক্তা এটা।'

ডিলার মুক্তাটা ট্রে-র উপর নাচাতে নাচাতে বলল, 'বোকা লোকের সোনা পাওয়ার গল্প জানো না? এ হচ্ছে সেই বোকার সোনা। এতবড় মুক্তা কে কিনবে? এসব জিনিস আসলে কেউ চায় না। এর কোনো মার্কেট নেই। এটা একটা মজার জিনিস, এই পর্যন্ত বলা যায়। দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে। ভেবেছ, একটা মহাদামি জিনিস পেয়েছ! দূর! কেবলই একটা মজার জিনিস, আর কিছু না।'

কিনোর মুখে দুর্ভাবনার ছাপ পড়ল। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে। 'এটা পৃথিবীর সেরা মুক্তা', চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কেউ কখনও এমন মুক্তা দেখেনি।'

ব্যবসায়ী বলল, 'আসলে তোমার মুক্তা অতিরিক্ত বড় আর জবুথবু। মজার জিনিস হিসেবে এর একটা দাম আছে। হয়তো কোনো যাদুঘরের সংগ্রহশালায় দুষ্প্রাপ্য সামুদ্রিক বস্তু হিসেবে কেউ সাজিয়ে রাখতে পারে। তা আমি এক হাজার পেশো পর্যন্ত দিতে পারি।'

কিনোর মুখ কালো হয়ে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করল। সে বলল, 'খুব ভালোভাবেই জানেন, এর দাম পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। আপনি আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছেন।'

বাইরে ভিড়ের মধ্যে দাম নিয়ে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ভয় পেল ডিলার। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার দোষ কী? আমি তো ঠিক দর বলেছি বাবা। অন্যদের জিজ্ঞেস করো। অথবা আমি অন্য ডিলারদের ডাকি। তাদের দেখাও তোমার মুক্তা। দ্যাখো, আমি অন্যায় বলেছি কি না।' একটা ছেলেকে ডাকল সে। 'বয়, তিনজন ডিলারকে ডেকে আনো। কেন, কী বৃত্তান্ত, কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বলবে, আমি তাদের ডেকেছি।'

তার বামহাত আবার চলে গেল পকেটের ভিতর। বার করে আনল আরও একটা মুদ্রা। আবার আগের মতোই নাচাতে লাগল সেটা।

কিনোর প্রতিবেশীদের মধ্যে কানাকানি শুরু হয়ে যায়। এ-রকম একটা কিছুর আশঙ্কা করেছিল তারা। মুক্তাটা বেশ বড়, কিন্তু অদ্ভুত। এক হাজার পেশো একেবারে ফেলনা নয়। নিঃস্ব লোকের কাছে অনেক টাকা। কিনোর আপত্তি করার কী আছে? গতকাল তো একটি পেশোও ছিল না তার।

কিন্তু কিনো শক্ত অনড় দেহে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মনে হল, দুর্ভাগ্য হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। শুরু হয়েছে নেকড়ের আনাগোনা, মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে শকুন। অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে। অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। কানের ভিতর বেজে উঠছে অশুভ সংগীত। টেবিলে কালো মখমলের উপর ঝিকমিক করছে মহামূল্য মুক্তা, ডিলার সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। কিনো জুয়ানার দিকে তাকাল। তারপর নতুন শক্তি খুঁজে পেল মনে।

অন্যান্য ডিলার ডেস্কের সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। ডেস্কের পিছনের সেই ডিলার বলল, 'আমি এই মুক্তার দাম বলেছি। এই যে মুক্তার মালিক। সে মনে করছে, ন্যায্য দাম বলিনি আমি। এখন তোমরা একবার দ্যাখো, পরীক্ষা করো। দাম

বলো।' কিনোর দিকে ফিরে লোকটা বলল, 'কত দাম বলেছি, তা কিন্তু ওদের বলিনি আমি, দেখলে তো?'

রোগা-পাতলা চেহারার একজন এগিয়ে এসে মুক্তা তুলে নিল। যেন এই প্রথম চোখে পড়ছে, এমনভাবে নেড়ে নেড়ে দেখল। তারপর অবজ্ঞার সঙ্গে রেখে দিল ট্রে-তে। শুকনোমুখে বলল, 'আমি ভাই দর-কষাকষির মধ্যে নেই। এর আবার দাম কী? আমি এ-জিনিস চালাতে পারব না। এ তো আসলে মুক্তা নয়, ইয়াবড় থেলো পাথর!' কথা বলতে বলতে ঠোঁট কোঁচকাল লোকটা।

এর পরের লোকটা এগিয়ে এসে নাড়াচাড়া করল মুক্তা। তার গলার স্বর নরম, লাজুক। পকেট থেকে আতশিকাচ বার করে মন দিয়ে পরীক্ষা করল জিনিসটা। তারপর মৃদু হাসল।

সে বলল, 'ভালো মুক্তা নয় এটা। এগুলো আমি চিনি। এর ভিতরটা নরম আর খড়িমাটিতে ভর্তি। কিছুদিন পরেই রঙ নষ্ট হয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাবে, তারপর শুকিয়ে যাবে। এই দ্যাখো—'

কিনোর হাতে আতশিকাচ তুলে দিল লোকটা। শিখিয়ে দিল, কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। কিনো আগে কখনও আতশিকাচে মুক্তা দেখেনি। মুক্তার বহুগুণ বর্ধিত উপরিভাগ দেখে বিষম অবাক হল সে।

তৃতীয়জন বলল, 'আমার এক খরিদ্দার এগুলো পছন্দ করে। আমি পাঁচশো পেশো দিয়ে কিনতে পারি। তার কাছে ছয়শো পেশোয় বেচব।'

কিনো ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে গিয়ে লোকটার হাত থেকে মুক্তা কেড়ে নিল। হরিণের চামড়ায় মুড়ে গুঁজে রাখল শার্টের ভিতর।

টেবিলের পেছন থেকে আগের লোকটি বলল, 'আমি একটা বোকামি করে ফেলেছি। কিন্তু কী আর করব? যখন বলেই ফেলেছি! ওই এক হাজারই দেব। কী করবে?'

কিনো তীক্ষ্নস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তোমরা ঠকিয়েছ আমাকে। মুক্তা এখানে বিক্রি করব না। অন্য কোনো বড় শহরে, চাই কি রাজধানীতে গিয়ে বেচব।'

তখন মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু হল ডিলারদের মধ্যে। বুঝতে পেরেছে, খেলাটা খুব বেশি কঠিন হয়ে গেছে। জানে এই ব্যর্থতার জন্যে চড়ামূল্য দিতে হবে তাদের। টেবিলের পিছনে বসা লোকটি বলল, 'আচ্ছা পনেরো শো দেব।'

কিন্তু কিনো ভিড় ঠেলে এগোতে চেষ্টা করল। লোকের অনুচ্চ কথাগুলো তার কানে পৌঁছচ্ছে, আর শুনতে পাচ্ছে নিজের টগবগ করে ওঠা রক্তের ডাক। জুয়ানা অতিকষ্টে ভিড় ঠেলে তার পিছন পিছন বাইরে এসে দাঁড়াল।

সন্ধেবেলা প্রতিবেশীরা তাদের পর্ণকুটিরে বসে রুটি আর কড়াইশুঁটি খেতে খেতে সকালবেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। মুক্তাটা দেখতে তো বড় সুন্দর মনে হয়েছিল। অথচ বিক্রি করতে গিয়ে বোঝা গেল, একেবারেই ফালতু জিনিস। মুক্তাব্যবসায়ীরা তো মাল চেনে! 'দ্যাখো, ওরা তো এ-নিয়ে নিজেদের মধ্যে

আলোচনা করেনি। সবাই আলাদা করে দর বলল। আসলে সবাই জানে, মুক্তাটার কোনো দামই নেই।'

'কিন্তু ধরো... এমনও তো হতে পারে, ওরা আগেই এসব ঠিক করে রেখেছিল!'

'তা-ই যদি হয়, বুঝতে হবে, সারাজীবন ওরা ঠকিয়েছে—আমাদের সবাইকে।'

কেউ কেউ আরও অনেক যুক্তি দেখাল, তর্ক করল। মুক্তা দেড়হাজার পেশোয় বিক্রি করলেই ভালো করত কিনো। দেড় হাজার পেশো কম টাকা নয়। এত টাকা সে কোনোদিন চোখেও দেখেনি। গোঁয়ার্তুমি করাটা ভুল হয়েছে। এমনও হতে পারে, সত্যি সত্যি রাজধানীতে গিয়েও ওই মুক্তার খরিদ্দার পাবে না। সে-কলঙ্কের কথা কি জীবনেও ভুলতে পারবে সে?

আবার কেউ কেউ অন্যরকমের আশঙ্কার কথা তুলল। এখানকার মুক্তা ব্যবসায়ীদের মুখের ওপর 'না' বলে চলে এসেছে কিনো। এরপর ওরাও হয়তো আর ওর মুক্তা কিনতে চাইবে না। মরেছে কিনো, নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে।

অবশ্য কয়েকজন অন্যসুরেও কথা বলল। কিনোর সাহস আর দাপট ওদের মনে গর্ব যোগায়। কে জানে, হয়তো ওরা সবাই এ-থেকে উপকার পাবে।

নিজের বাড়িতে কিনো উবু হয়ে বসে আছে মাদুরে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। আগুনের গর্তের ভিতর পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে তার মুক্তা। তাকিয়ে আছে মাদুরের বুনটের আঁকাবাঁকা নকশার দিকে। নকশাটা একসময় তার মাথার ভিতর কিলবিল করতে শুরু করে। তার মনে হয়, একটি জীবন সে হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু অন্য জীবনের নাগাল এখনও পায়নি। ভয় করছে তার। জীবনে কখনও বাড়ি থেকে বেশিদূর যায়নি। অপরিচিত মানুষ আর অচেনা জায়গাকে সবসময় ভয় পায় সে। রাজধানী নামের বিদ্‌ঘুটে দৈত্যটার কথা ভাবলেই আঁতকে ওঠে। পর্বতগুলো ছাড়িয়ে অনেক দূরে—প্রায় হাজার মাইল দূরে—সমুদ্রের ওপর ভাসছে সেই রাজধানী। পথের প্রতিটি অংশ বড় কষ্টের, বড় বিপদের। কিন্তু পুরনো জীবন যখন হারিয়েই ফেলেছে, তখন নতুন জীবনের পথে তো পা বাড়াতেই হবে। ভবিষ্যতের যে-স্বপ্ন তার মনে আঁকা হয়ে গেছে, তা সত্যি। কোনোদিন মুছে ফেলা যাবে না। মনে মনে 'যাব' বলে যে-প্রতিজ্ঞা করেছে, তা-ও এক মূর্ত জিনিস হয়ে উঠেছে। যাবার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা মানেই ধরে নেওয়া যায়, অর্ধেক হয়ে গেছে কাজটা।

জুয়ানা বাচ্চার শুশ্রূষা করল, তারপর বসল রুটি সেঁকতে। কাজ করতে করতে কিনোকে লক্ষ করে সে।

জুয়ান টমাস এসে বসল কিনোর পাশে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। কিনোই একসময় নীরবতা ভেঙে বলল, 'আর কী-ই বা করতে পারতাম, বলো? ওরা তো ঠগ!'

জুয়ান টমাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। সে বয়সে বড়। কিনো তার কাছে বুদ্ধি-পরামর্শ আশা করে। সে বলল, 'বোঝা কঠিন। জন্ম থেকে শুরু করে মরার পর আক্রা কফিন বাক্স পর্যন্ত—আমাদের ওপর জোচ্চুরি চলছে, এ তো সবাই জানে।

তারপরও তো বেঁচে আছি। তুমি যে শুধু মুক্তাব্যবসায়ীদের মুখের ওপর 'না' বলেছ, তা তো নয়, তুমি প্রতিবাদ করেছ গোটা ব্যবস্থার। গোটা জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছ। তোমার জন্যে এখন আমার ভয় হচ্ছে।'

কিনো প্রশ্ন করে, 'না-খেয়ে থাকব, তার চেয়ে বড় কোনো ভয় আছে?'

জুয়ান টমাস ধীরে ধীরে মাথা দোলায়। 'সে ভয় তো আমাদের সবারই আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, ধরো, তুমিই ঠিক বলেছ, মুক্তাটা খুবই দামি। কিন্তু তাতে কি সব ল্যাঠা চুকে গেল?'

'বুঝলাম না।'

জুয়ান টমাস বলল, 'আমিও সব বুঝতে পারছি না। কিন্তু তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে। এক নতুন পথে হাঁটতে শুরু করেছ। সে-পথ তোমার অচেনা।'

কিনো বলল, 'যেতে আমাকে হবেই। শিগগিরই রওনা হব।'

জুয়ান টমাস একমত হল তার সঙ্গে। 'হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবে। কিন্তু ভয় হচ্ছে রাজধানীতে গিয়েও আবার একই পরিস্থিতিতে-না পড়ো। এখানে তো তবু তোমার জানাশোনা লোকজন আছে। আমি, তোমার ভাই, আছি। আর ওখানে তো তুমি একেবারে একা!'

কিনো চেঁচিয়ে উঠল, 'তা আর কী করব? এখানে তো সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ছেলেকে একটু সুযোগ দিতেই হবে। এই কারণেই ওদের এত আপত্তি। তা আমার বন্ধুবান্ধব আছে, ওরা নিশ্চয় পাশে গিয়ে দাঁড়াবে!'

'যতক্ষণ কোনো বিপদ-আপদ কিংবা অসুবিধে না-হয়, ওরা পাশে থাকবে।' বলে উঠে দাঁড়াল জুয়ান টমাস। বলল, 'যাও, দেখা যাক। খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ।'

বসেই রইল কিনো। ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল না। তার কথাগুলো ওর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

জুয়ান টমাস চলে যাবার অনেকক্ষণ পরও কিনো মাদুরে বসে রইল। দ্রুত ভাবছে। একধরনের আলস্য ভর করেছে ওর ওপর। আবছা নিরাশা খেলা করছে মাথায়। সব পথ যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে। অন্তর্গত হৃদয়ে আবার বাজছে অশুভ সংগীত। রাত বাড়ে, সব খুঁটিনাটি শব্দ তার কানে এসে পৌঁছয়। ঘুম-ঘুম স্বরে ডেকে ওঠে গাছের পাখিরা। বিড়ালের প্রেম-গুঞ্জন। বালুবেলায় ঢেউয়ের ওঠা-পড়া। চুলোর আগুনের মৃদু আলোয় মাদুরের নকশাগুলো হঠাৎ বুঝি লাফিয়ে ওঠে তার চোখের সামনে।

জুয়ানা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করে কিনোকে। কিন্তু তার জানা আছে, শুধু নীরবে কাছে থেকে কিনোকে সঙ্গ দেওয়া ছাড়া করার কিছু নেই। যদিও অন্তরে বারবার অশুভ সংগীত বেজে ওঠে, তবু সে প্রাণপণে লড়তে থাকে তার সঙ্গে, বিড়বিড় করে গাইতে থাকে বিপদভঞ্জন মন্ত্র। কয়োটিটোকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে তাকে শোনায় সেই সংগীত।

কিনো উঠল না, খাবারও চাইল না। জুয়ানা জানে, খিদে না-লাগলে খাবার চায় না লোকটা। মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে আছে, বিপদের আশঙ্কা ফুটে উঠেছে চোখে। যেন বাইরে রাতের নিশ্চিদ্র অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওদের লক্ষ করছে প্রেতাত্মা, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে শয়তান।

যেন নিঃশব্দে হুঁশিয়ার করছে কেউ, লড়াইয়ের জন্যে ডাকছে। বুকে হাত দিয়ে জামার নিচে লুকানো ছুরির স্পর্শ অনুভব করে কিনো। উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

জুয়ানা থামাতে চেয়েছিল তাকে; হাতও তুলেছিল। ভয়ে হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ। কিন্তু কিনো ফিরে তাকাল না। অনেকক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বেরিয়ে পড়ল। জুয়ানা শুনতে পেল দ্রুত পায়ের চলা, ধস্তাধস্তি, তারপর মারামারির শব্দ। মুহূর্তের জন্যে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল সে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিড়ালের ঠোঁটের মতো ওর অধরোষ্ঠ কুঁচকে ঢুকে গেল দাঁতের পিছনে। কয়োটিটোকে মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে চুলো থেকে টেনে বার করল পাথরের চাঁই। সেটা হাতে নিয়ে বাইরে পা বাড়াল। কিনো শুয়ে আছে মাটির উপর, প্রাণপণ চেষ্টা করছে উঠে বসার। কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূরে যেন কিসের ছায়া। ভেসে আসছে সমুদ্রের ঢেউয়ের অবিরল ওঠা-পড়ার শব্দ। শয়তানটা কাছেই কোথাও আছে। হয়তো ঝোপঝাড়ের আড়ালে, বেড়ার পিছনে কিংবা বাড়ির আশপাশে, বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে।

পাথর ফেলে দেয় জুয়ানা। কিনোকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। ওর কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ঢোকে কিনো। তার মাথা থেকে গলগলিয়ে রক্তের ধারা নামছে। কানের কাছ থেকে চিবুক পর্যন্ত গভীরভাবে কেটে গেছে গাল। বেশ গর্ত হয়ে গেছে, জমাট রক্তরেখা দেখা যায়। কিনো প্রায় সংজ্ঞা হারিয়েছে। বারবার মাথা দোলাচ্ছে সে—একবার এপাশে, একবার ওপাশে। শার্টটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে। জুয়ানা তাকে মাদুরে বসিয়ে দিল। স্কার্টের কোনা দিয়ে মুছে দিল গায়ের রক্ত। একটা পাত্রে করে খানিকটা পুলকে এনে খাওয়াল। তবু মাথা দোলাতে লাগল কিনো। অন্ধকার তাড়াতে চেষ্টা করছে সে।

জুয়ানা জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'জানি না', উত্তর দিল কিনো। 'দেখতে পাইনি।'

পানি এনে কিনোর মুখ ধুইয়ে দিল জুয়ানা। তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কান্না-জড়ানো গলায় জুয়ানা বলল, 'কিনো, লক্ষ্মী, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

কিনো ক্লান্ত স্বরে বলল, 'পাচ্ছি।'

'কিনো, মুক্তাটা ভালো নয়। সাক্ষাৎ অলক্ষুণে। পাথরের ঘা দিয়ে নষ্ট করে ফেললে হয় ওটা। কিংবা চলো, সমুদ্রেই ফেলে দিই। কিনো, মুক্তাটা অমঙ্গল। অপদেবতা।'

কিনোর শরীরের শিথিল ভাবটা চলে গেল। আবার টানটান হয়ে এল স্নায়ু। 'না। আমি শেষপর্যন্ত লড়ে যাব। আমিই জিতব শেষে। একটা সুযোগ তো নিতেই হবে।'

মাদুরের উপর হাতের মুঠো দিয়ে ঘুসি মারল সে। 'কেউ আমাদের সৌভাগ্য ছিনিয়ে নিতে পারবে না।' তারপর তার চোখ শান্ত হল। জুয়ানার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'বিশ্বাস করো, আমি একজন মরদ।' কথা বলতে বলতে তার মুখে বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে ওঠে।

'সকালে উঠে আমরা নৌকায় উঠে সমুদ্র পাড়ি দেব। তুই আর আমি। রাজধানীতে চলে যাব। কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না। আমি তো মরদ!'

কাঁপা কাঁপা গলায় জুয়ানা বলল, 'না, বাপু। আমার ভয় করছে। মরদকেও তো খুন করা যায়! চলো, সমুদ্রের মুক্তা সমুদ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।'

ধমকের সুরে কিনো বলল, 'শ্‌শ্‌! বলছি, আমি একজন মরদ, তোর পাশে আছি, ভয়ের কিছু নেই। একটু ঘুমিয়ে নিই, আয়। প্রভাতে আলো ফুটলেই রওনা দেব। আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাবি না তো?'

'না, লক্ষ্মী।'

নারীর চোখের ওপর পুরুষটির দৃষ্টি শিথিল, উষ্ণ হয়ে উঠল। নারীর চিবুকে হাত বুলিয়ে পুরুষ বলল, 'একটু ঘুমিয়ে নিই, আয়।'

পাঁচ

সেদিন চাঁদ উঠল বেশ দেরিতে—ভোরের প্রথম মোরগ ডাক দেবার একটু আগে। কিনো অন্ধকারে চোখ মেলে তাকায়। কাছেই নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সে অকম্পিত শরীরে শুয়ে থাকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে যে-জোছনা ঢুকে পড়েছে ঘরে, তার আলোয় দেখতে পায়, জুয়ানা প্রায় নিঃশব্দে উঠে পড়েছে। এগিয়ে গেছে চুলোর কাছে। পাথর সরানোর ক্ষীণ শব্দ হল। তারপর ছায়ামূর্তির মতো সে নীরবে পা বাড়াল দরজার দিকে। একবার ফিরে তাকাল কয়োটিটোর দিকে। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

কিনোর শরীর প্রচণ্ড রাগে জ্বলে ওঠে। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে সে-ও। জুয়ানার মতোই নিঃশব্দ পায়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। দ্রুতপায়ে জুয়ানা এগোচ্ছে সৈকতের দিকে। নুড়িগুলোর কাছে পৌঁছে সে দেখতে পেল, কিনো আসছে পিছন পিছন। অমনি দৌড় লাগাল জুয়ানা। পানির কাছে পৌঁছে হাত উঁচু করেছে ছোড়ার জন্য, এমন সময় কিনো ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরল হাত, মুঠোর ভিতর থেকে ছিনিয়ে নিল মুক্তা। প্রবল বেগে কিনো ওর মুখে চড় বসাল। বড় পাথরগুলোর উপর পড়ে গেল জুয়ানা। পাশ থেকে কিনো ওর শরীরে কষে লাথি দিল। আবছা আলোয় দেখতে পেল, ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে ওর শরীরে, স্কার্ট খুলে গেল। ঢেউ নেমে যাবার সময় দেখা গেল স্কার্টটা লেপটে আছে পায়ের সঙ্গে।

কিনো চোখ নামিয়ে দেখল তাকে। রাগে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। সাপের মতো হিস্‌হিস্‌ শব্দ বেরুচ্ছে মুখ থেকে। নির্ভয়, নিরুত্তাপ চোখে জুয়ানা তাকিয়ে

আছে স্বামীর দিকে, ঠিক জবাই হবার আগে যেভাবে ভেড়া তাকায় কসাইয়ের দিকে। লোকটির মধ্যে খুনির বন্যতা টের পাচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। মনে-মনে সে মেনে নিয়েছে ব্যাপারটা। প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা করবে না, প্রতিবাদও নয়।

ধীরে ধীরে কিনোর রাগ কমল। তার জায়গায় এল বিরক্তি। জুয়ানার কাছ থেকে সরে গেল সে। সৈকত, ঝোপঝাড় পার হয়ে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। রাগে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল।

হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে থমকে দাঁড়াতে হয় তাকে। অন্ধকারে কে যেন জাপটে ধরেছে। কিনোর সারাশরীরে উন্মত্তের মতো কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার তৎপর হাতের লোভী আঙুলগুলো। প্রবল ঝাঁকুনিতে তার হাতের মুঠি আলগা হয়ে যায়, ছিটকে পড়ে যায় মুক্তা। আত্মরক্ষার তাগিদ অনুভব করামাত্র কিনো ছুরি বার করে।

জুয়ানা কোনোরকমে নিজের অবসন্ন শরীর টেনে তোলে। ব্যথায় নীল হয়ে আছে মুখ, কোমরেও ব্যথা করছে। স্কার্টটা আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কিনোর ওপর রাগ করতে পারছে না সে। কিনো বলেছে, 'আমি মরদ।' জুয়ানা জানে, ওই কথা ওর কাছে কতখানি সত্যি। জুয়ানা জানে ওই আধপাগলা, আধাঈশ্বর মানুষটা ওর কাছে কী! ওই মানুষটার শক্তি আছে সাগরজয়ের, পাহাড় পেরোবার। নারীর হৃদয় দিয়ে জুয়ানা অনুভব করতে পারে তার পৌরুষ। আধপাগলা, আধাঈশ্বর ওই পুরুষ তার স্বামী। তাকে বিষম প্রয়োজন জুয়ানার। তাকে ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতে পারে না সে। তার কথা মেনে চলতে হবে। কোনো উপায় নেই। জুয়ানা টলতে টলতে এগিয়ে চলল সৈকত ছেড়ে।

দক্ষিণদিক থেকে ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে আকাশ। চাঁদটা একবার ডুব দিচ্ছে মেঘের আড়ালে, আবার ভেসে উঠছে। এভাবে একবার জোছনায় আর একবার গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাঁটতে লাগল জুয়ানা। বড় একটা পাথরখণ্ডের নিচে কী যেন জ্বলজ্বল করছে, দেখতে পেল। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে। সেই মহামূল্য মুক্তা। জুয়ানা হাতে তুলে নিল মুক্তাটা। একবার ভাবল আবার সৈকতে ফিরে যাবে কিনা। অসমাপ্ত কাজটা শেষ করার এমন সুযোগ আর মিলবে না। এমন সময় মেঘ সরে গেল। জোছনায় দেখা গেল, সামনে পথের উপর দুটো নরদেহ পড়ে আছে। সামনে এগিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পেল, একটি কিনোর। অপরটি এক অপরিচিত লোকের। তার গলা দিয়ে রক্তের ফিনকি বয়ে যাচ্ছে।

কিনোর শরীর নড়ে উঠল হাতের তালুতে চ্যাপটা হয়ে-যাওয়া মশার মতো। অস্ফুট গোঙানির শব্দও পাওয়া গেল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ জুয়ানার মনে হল, অতীতের জীবন তাদের সত্যি শেষ হয়ে গেছে; নতুন জীবনে পা দিয়েছে তারা। পথের উপর পড়ে-থাকা লাশটা, কিনোর রক্তাক্ত ছুরি, সবই তার স্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আর কখনই সবকিছু আগের মতো হবে না। মুক্তা পাবার আগের সেই অনাবিল শান্তির জীবন ফিরে আসবে না কোনোদিন। আগের চিন্তাটা মন থেকে বিদায় করল জুয়ানা। এখন অন্য কিছু নয়, নিজেদের বাঁচাতে হবে।

জুয়ানার ব্যথাটা আর নেই। শিথিল ভাবটাও কেটে গেছে। মৃতদেহ পথের উপর থেকে টেনে সরিয়ে ঝোপের আড়ালে ফেলল সে। কিনোর কাছে গিয়ে স্কার্টের কোনা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল। জ্ঞান ফিরে এসেছে কিনোর।

সে বলল, 'মুক্তা নিয়ে গেছে ওরা। হাতছাড়া হয়ে গেল জিনিসটা। যাক, সব শেষ।'

যেন শিশুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, এমন সুরে জুয়ানা বলল, 'শ্‌শ্‌... এই যে তোমার মুক্তা। আমি কুড়িয়ে পেয়েছি পথ থেকে। শুনতে পাচ্ছ? এই যে তোমার মুক্তা! বুঝতে পারছ? একটা লোক মেরে ফেলেছ তুমি। পালাতে হবে আমাদের। ওরা আমাদের খোঁজে আসবে, জানো? সকালের আলো ফোটার আগেই সরে পড়তে হবে আমাদের।'

কিনো ধরাগলায় বলল, 'ওরা আমার ওপর হামলা করেছিল। জান বাঁচাতে গিয়ে ছুরি মেরেছি আমি।'

জুয়ানা বলল, 'কালকের কথা মনে নেই? ওইসব কথা কেউ শুনবে? শহরের লোকগুলোর কথা মনে পড়ছে না? তুমি যা-ই বলো, কেউ বিশ্বাস করবে?'

কিনো লম্বা দম নিল। দুর্বলতা কেটে যাচ্ছে। বলল, 'না, তুই-ই ঠিকই বলেছিস।' আবার শক্ত হয়ে আসছে পেশি, স্নায়ু। আবার সে মরদ হয়ে উঠছে।

'ঘরে যা, কয়োটিটোকে নিয়ে আয়। খাবার যা আছে তা-ও নিয়ে আসবি। আমি নৌকা ভাসাই। এখনই রওনা দেব।'

ছুরি হাতে তুলে নিয়ে সৈকতের দিকে পা বাড়াল কিনো। চলে এল নৌকার কাছে। শয়তান ভর করেছে তার সংসারের ওপর। গরানের ডালে বসে রক্তচোখে তাকিয়ে আছে অপদেবতা। সাগরের ঢেউয়ে অশুভ সংকেত। নৌকার ভিতরে মস্তবড় গর্ত চোখে পড়ল। কিনোর দাদার আমলের এই নৌকার ওপর বারবার প্রলেপ পড়েছে। শক্ত, মজবুত তার নৌকা। আজ কোন্ শয়তান এর তলা ফুটো করে দিয়েছে, কে জানে! কিনোর অস্থিমজ্জায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। মানুষ খুন করার চেয়ে নৌকা নষ্ট করা কম অপরাধ নয়। কী দোষ করেছে নৌকাটা? কিনোর ভিতরকার পশুটা এতক্ষণে জেগে ওঠে। একটা অনর্থ ঘটিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিলে কেমন হয়? পরিবারের কথা ভেবে মাথা ঠাণ্ডা করে কিনো। নিজে বাঁচতে হবে, ওদের বাঁচাতে হবে। গালের যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল কিনো। বালিয়াড়ি পার হয়ে বাড়িমুখো ছুটল সে। প্রতিবেশীদের কারও নৌকা ভাসিয়ে নেবার কথাও তার মনে হল না। মোরগ ডাকছে। সকাল হবার দেরি নেই। কোনো কোনো কুটির থেকে চুলোয় আগুন দেবার শব্দ ভেসে আসছে। প্রথম রুটি সেঁকার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। ফিকে হয়ে আসছে জোছনা। রাতের বাতাস বন্ধ হয়েছে। ভোরের টাটকা, নতুন হাওয়া ঢেউ তুলছে মোহনার বুকে। তবু একটা দম-আটকানো ভাব চারদিকে। মেঘ জমছে। হয়তো ঝড় হবে।

বাড়ির দিকে দৌড়তে দৌড়তে কিনোর সংশয় দূর হয়ে যায়। একটা কাজই করার আছে এখন। পকেটে মুক্তার অস্তিত্ব অনুভব করে সে। দেখে নেয়, ছুরিটা ঠিক আছে কি না।

সামনে আগুনের আভা দেখে তার মন দমে গেল। ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠল শিখাগুলো। আলোকিত হয়ে উঠল পথ, আশপাশের গাছপালা, ঝোপঝাড়। কিনোর বুঝতে আর বাকি থাকে না, তার বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। বাড়ির দিক থেকে ছুটে ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল জুয়ানা। কোলে কয়োটিটো। জুয়ানার কাঁধ আঁকড়ে ধরে কিনো। বাচ্চাটা ভয় পেয়ে চেঁচাচ্ছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। কিনো সবই বুঝতে পারছে। তবু জুয়ানা বলল, 'বাড়ির সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে ওরা। মেঝে খুঁড়ে তছনছ করেছে। বাচ্চার দোলনাটা নষ্ট করতেও আটকায়নি। তারপর আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

তীক্ষ্ণস্বরে কিনো জানতে চাইল, 'কারা?'

'জানি না। লোকগুলো কালো।'

আগুনের শিখাগুলো কিনোর বুকে কাঁপন ধরায়। জুয়ানার কাঁধ আঁকড়ে ধরে প্রায় ছুটতে ছুটতে জুয়ান টমাসের বাড়িতে ঢুকে পড়ে সে। প্রতিবেশীরা বেরিয়ে পড়েছে, সমবেত হয়েছে কিনোর বাড়ির সামনে। ছেলেপিলেদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। জুয়ান টমাসও ছুটেছে সেদিকে। তার বউ অ্যাপোলোনিয়া চেঁচিয়ে কাঁদছে, ভাবছে, মারা গেছে তাদের আত্মীয়স্বজন। কিনোর কাছে এসে পড়ল অ্যাপোলোনিয়া। কিনো ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাপোলোনিয়া, চেঁচিয়ো না। আমাদের কিছু হয়নি।'

অ্যাপোলোনিয়া বলল, 'এখানে এলে কীভাবে?'

'প্রশ্ন কোরো না। আগে জুয়ান টমাসের কাছে গিয়ে ওকে নিয়ে এসো। অন্য কেউ যেন জানতে না-পারে। জানলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

অ্যাপোলোনিয়া নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। হাতদুটো অস্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ভাই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই জুয়ান টমাস ফিরে এল বউয়ের সঙ্গে। একটা মোম জ্বেলে নিয়ে ঘরের কোণে চলে এল। গুটিসুটি মেরে বসে আছে কিনো আর তার পরিবার। বড়ভাইয়ের মতোই গম্ভীর স্বরে বলল, 'অ্যাপোলোনিয়া, দরজার কাছে গিয়ে পাহারা দাও।' তারপর ভাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'কী হয়েছে?'

কিনো বলল, 'অন্ধকারে কে যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তুমুল লড়াই হয়েছে। লোকটাকে মেরে ফেলেছি আমি।'

জুয়ান টমাস তাড়াতাড়ি বলল, 'কে সে?'

কিনো বলল, 'চিনতে পারিনি। অন্ধকার ছিল তখন। ঘোর অন্ধকার।'

জুয়ান টমাস বলল, 'মুক্তা—বুঝলে ভাই, মুক্তাটা অলক্ষুণে। শয়তান আছে ওর ভিতরে। বিক্রি করে আপদ বিদায় করলেই পারতে। এখনও সময় আছে। বিক্রি করে দিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনো।'

কিনো বলল, 'আহা, ভাই, বুঝতে পারছ না। জীবনের চেয়ে সম্মান বড়। ওদিকে কী হয়েছে, তা তো জানো না। আমার নৌকাটা ফুটো করে দেয়া হয়েছে। আমার

ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে। ওদিকে ঝোপের আড়ালে পড়ে আছে লাশ। পালানোর সব পথ বন্ধ। আমাদের লুকিয়ে রাখো, ভাই।'

ভাইয়ের কপালে দুর্ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে কিনো তাড়াতাড়ি বলল, 'বেশিক্ষণ নয়, শুধু আজকের দিনটা। রাত হলেই চলে যাব।'

জুয়ান টমাস বলল, 'ঠিক আছে, থাকো লুকিয়ে। আমি তো আছি।'

কিনো বলল, 'আমি চাই না, তোমার বিপদ হোক। অন্ধকার হলেই আমরা চলে যাব। তোমার আর কোনো ভয় থাকবে না।'

জুয়ান টমাস বলল, 'আমি তোমাদের রক্ষা করব।' তারপর অ্যাপোলোনিয়াকে ডেকে বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও। ফিসফিস করেও যেন উচ্চারণ কোরো না, কিনো এখানে লুকিয়ে আছে।'

অন্ধকার ঘরের কোণে সারাদিন লুকিয়ে থাকল তারা। প্রতিবেশীদের গতিবিধি লক্ষ করল বেড়ার ফাঁক দিয়ে। ওদের নিয়ে যত কথাই বলাবলি হল, সব শুনতে পেল। নৌকাটা ফুটো করে দেওয়ার খবরে তারা কেমন মুষড়ে পড়ল, তা-ও কানে এল। প্রতিবেশীদের মনে যাতে কোনো সন্দেহ না-জাগে, তার সব ব্যবস্থাই করেছে জুয়ান টমাস। কিনো, তার আর বাচ্চার ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার সীমা রইল না। একজনকে বলল জুয়ান টমাস, 'জানোই তো বাপু, শয়তানের আছর হয়েছিল আমার ভাইটার ওপর। সমুদ্রের কূল বরাবর সোজা দক্ষিণদিকে সরে গেছে শয়তানের আছর কাটানোর জন্যে।' অন্য একজনকে বলল, 'সাগরের মায়া কি আর সহজে কাটাতে পারবে সে? হয়তো অন্য একটা নৌকা জোগাড় করে নিয়েছে।' আবার কাকে যেন বলল, 'অ্যাপোলোনিয়া বেচারি তো দুঃখে-চিন্তায় মুষড়ে পড়েছে একেবারে।'

সেদিন ঝড়ে কেঁপে উঠল সমুদ্রতীরের লোকালয়টি। উচ্ছ্বসিত কান্নার মতো বাতাস এসে আছড়ে পড়তে লাগল কুটিরগুলোর খোড়ো চালার উপর। সমুদ্রে কোনো নৌকা বার হয়নি নিরাপত্তার অভাবে। জুয়ান টমাস প্রতিবেশীদের বলল, 'কিনো যদি নৌকায় চড়ে সমুদ্রে গিয়ে থাকে, তো এতক্ষণে ডুবে মরেছে।' বারবার প্রতিবেশীদের বাড়ি ঢুঁ দিতে শুরু করল জুয়ান টমাস। প্রত্যেকবারই সঙ্গে নিয়ে আসতে লাগল কিছু না-কিছু জিনিস। কখনও নিয়ে এল লাল কড়াইশুঁটির ব্যাগ, কখনও চালের থলি। একবার আনল এককাপ শুকনোমরিচ, লবণের ডেলা, আটইঞ্চি লম্বা ছুরি। ছুরিটা দেখে কিনোর চোখ চকচক করে ওঠে।

সাগরের বুকে ঝড়ো বাতাস উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সাদা হয়ে গেছে জল। আতঙ্কগ্রস্ত গরুর পালের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গরানগাছের মাথাগুলো। মাটি থেকে মিহি ধুলোবালি চক্রাকারে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে, মেঘের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। প্রবল বাতাসে যখন মেঘ উড়ে যাচ্ছে, ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আকাশ, তখন ধুলোর বৃষ্টি ঝরছে তুষারের মতো।

সন্ধে হল। জুয়ান টমাস এসে বসল ভাইয়ের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে, কথা হল তাদের। 'কোথায় যাবে?'

কিনো বলল, 'উত্তরে। শুনেছি, বড় শহরগুলো সব উত্তর দিকেই।'

'সমুদ্রের ধার দিয়ে যেয়ো না। ওইসব জায়গায় তোমাকে খোঁজার জন্যে দল তৈরি করা হয়েছে। শহরেও তোমাকে খোঁজা হবে। মুক্তাটা কি এখনও তোমার কাছে আছে।'

'আছে। কাছেই থাকবে। উপহার হিসেবে হয়তো কাউকে দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন তো দুঃসময়। এখন এর সঙ্গে জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। এখন কাছেই রাখব মুক্তাটা।' কিনোর স্বরে তিক্ততার আভাস। কঠিন আর নির্দয় মনে হচ্ছে তাকে।

কয়োটিটো ফুঁপিয়ে উঠল। জুয়ানা ওকে বুকে জাপটে ধরে মন্ত্র পড়তে শুরু করে।

জুয়ান টমাস বলল, 'ঝড়ো বাতাস বেশ কাজে লাগবে। কেউ তোমাদের পিছু নেবে না।'

চাঁদ ওঠার আগে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ওরা। তখন চারদিকে ঘোর অন্ধকার। বিদায়ের আগে জুয়ান টমাসের বাড়ির সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে উঠে দাঁড়াল। কয়োটিটোকে অভ্যেসমতো মাথা-ঢাকা শালের সঙ্গে পেঁচিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে জুয়ানা। মুখটা পাশ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে আছে বাচ্চাটা। জুয়ান টমাস ভাইকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করল। দুইগালে চুমু খেল। যেন আর কখনও দেখা হবে না, এমনভাবে বলল, 'খোদা হাফেজ।' তারপর মনে করিয়ে দিল, 'মুক্তাটা তাহলে হাতছাড়া করছ না'!

কিনো বলল, 'মুক্তাটা আমার আত্মা হয়ে গেছে, ভাই। ওটা হারালে যে আত্মাও হারাব। চলি, ঈশ্বর সহায় হোন।'

ছয়

প্রচণ্ড, খ্যাপা ঝড়ের সঙ্গে ছুটে আসছে বালি, ডালপালা, এমনকি ছোটছোট পাথরের টুকরো। জুয়ানা আর কিনো শরীর শক্ত করে কাপড় জড়িয়ে নেয়, ঢেকে রাখে নাক-মুখ। তারপর বেরিয়ে পড়ে বাইরের পৃথিবীর উদ্দেশে। পা ফেলে অতি সাবধানে। শহরের প্রধান এলাকা এড়িয়ে যেতে হচ্ছে। অনেক বাড়ির দরজার সামনে লোক শুয়ে থাকে। তারা কেউ দেখে ফেলতে পারে। এমন সময় শহরে কেউ বাইরে বেরোয় না। হঠাৎ ওদের দেখে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। ওরা চলল শহরের প্রান্ত ঘেঁষে, সোজা উত্তরদিকে। আকাশের তারা দেখে পথ চিনতে হচ্ছে। ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মেঠোপথ গ্রামের-পর-গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গেছে লোরেটো শহরের দিকে। সেখানে নাকি মাতা মেরির অধিষ্ঠান হয়।

কিনো খুশি, প্রচণ্ড ধূলিঝড়ে সব পদচিহ্ন ঢেকে যাচ্ছে। আকাশে উঁকি দিচ্ছে সন্ধ্যাতারা। পথ চিনতে ভুল হচ্ছে না। বেশ দ্রুত হাঁটতে থাকে সে। অন্য কোনো শব্দ তার কানে পৌঁছয় না, শুধু অনুগামিনী জুয়ানার পায়ের শব্দ ছাড়া। জুয়ানাকে বেশ কষ্ট করে ছুটতে হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য।

কিনোর মনে এক প্রাগৈতিহাসিক চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যে-মানুষ সবসময় রাতকে ভয় পেয়েছে, অপদেবতার অকল্যাণ আশঙ্কায় নির্জীব হয়ে থেকেছে, আজ যেন কোথা থেকে সে পেয়েছে বন্যতা, তীব্রতা। অদম্য সাহসে পা ফেলছে। আকাশের তারা তাকে পথ দেখায়। প্রচণ্ড ঝড় তার চারপাশে আছড়ে পড়ে। কিন্তু কিছুই তার চলা থামাতে পারে না। সপরিবারে নতুন যাত্রাটা সে বরং উপভোগই করে। নীরবে, একঘেয়েভাবে হেঁটে চলে তারা ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা। পথে কারও সাথে দেখা হয়নি।

অবশেষে দেখা দিল কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়া চাঁদ। চাঁদটা একটু উপরে উঠতেই বাতাসের আক্রোশ কমল। শান্ত হল প্রকৃতি।

সামনে ছোট রাস্তা চোখে পড়ল। পুরু ধুলো জমেছে সেখানে। বাতাস নেই। এবার তো পায়ের দাগ থেকে যাবে। আশঙ্কাটা মনে ঠাঁই দিল না কিনো। নিজেদের এলাকা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। তাছাড়া ভোরবেলা কোনো-না-কোনো গাড়ি নিশ্চয় যাবে এ-পথ দিয়ে। পায়ের দাগ ঢাকা পড়ে যাবে আবার।

একনাগাড়ে সারারাত পথ চলল ওরা। চারপাশে অশুভ সংগীত বাজতে লাগল। ঝোপের মধ্যে হায়েনা কখনও হাসে, কখনও চিৎকার করে ওঠে। মাথার উপর চক্কর দেয় পেঁচা, বিদ্‌ঘুটে স্বরে ডাকে। একটু দূর দিয়ে নিচু ঝোপঝাড় সশব্দে দলাই-মলাই করে হেঁটে গেল বিরাট এক প্রাণী। আত্মরক্ষার তাগিদ অনুভব করল কিনো। ছুরি বার করে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল বাট। লড়াই করে বাঁচতে হবে। মাথার ভিতর বিজয়োল্লাসের ধুন বাজে : বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে শুক্তিবীজ। পুরো সংসারের বাঁচা-মরা জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।

ধুলোর উপর চপ্পলের মৃদু আঁচড় বসিয়ে হাঁটতে থাকল ওরা। যখন ভোর হয় হয়, তখন পথ থেকে সরে এসে গর্তের আড়াল খুঁজতে শুরু করল কিনো। দিনের বেলাটা লুকিয়ে থাকতে হবে। এমন একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল পথের পাশেই। খুব সম্ভব হরিণ শুয়ে থাকত সেখানে। চারদিকে শুকনো গাছের ঘন পর্দা, রাস্তা থেকে আড়াল করে রেখেছে গর্তটাকে। জুয়ানা গর্তের ভিতরে বসে বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিল পাতার স্তূপের উপর। কিনো গেল রাস্তায় পায়ের চিহ্ন মুছে দিতে। কোন্‌খানে ওরা রাস্তা ছেড়ে সরে এসেছে, যেন বোঝা না-যায়।

দিনের প্রথম আলো ফুটতেই কিনো গাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ শুনতে পেল। হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার পাশে লুকিয়ে পড়ল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনে দিয়ে ছুটে গেল বলদ টানা দুই-চাকার ভারী গাড়ি একটা। গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর রাস্তায় উঠল কিনো। ওদের পায়ের চিহ্ন মুছে গেছে। জুয়ানার কাছে ফিরে এল সে।

অ্যাপোলোনিয়ার দেওয়া নরম রুটি বার করে কিনোকে খেতে দিল জুয়ানা। খানিক পর ঘুমিয়ে নিল একটু। কিন্তু কিনোর চোখে ঘুম নেই। চুপচাপ বসে সামনের মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। পিঁপড়েগুলো চরে বেড়াচ্ছে সারি দিয়ে। ওদের চলার

পথে পা রাখে কিনো। পিঁপড়েগুলো উঠে পড়ল পায়ের উপর, তারপর পা পেরিয়ে অব্যাহত রাখল সামনে চলা।

সূর্য তপ্ত হয়ে উঠল। সমুদ্র অনেক দূরে। এখানে বাতাস শুকনো। বেলা যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে তাপ। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে লাক্ষার সুবাস।

জুয়ানার ঘুম ভাঙতেই সতর্ক করে দেয় কিনো। 'ওই গাছগুলোর ব্যাপারে সাবধান। ওগুলোতে যদি হাত লাগে, আর সে হাত যদি চোখে দিস, ব্যস্! একেবারে কানা হয়ে যাবি। আর ওই-যে গাছগুলো থেকে কষ গড়াচ্ছে, ওগুলো থেকেও সাবধান! খবরদার ডাল ভাঙবিনে। যদি ভাঙিস লাল কষ বেরিয়ে আসবে। খুব অলক্ষুণে ব্যাপার।'

জুয়ানা মাথা নেড়ে মৃদু হাসল। এসব তার জানা। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি পিছু নেবে? কী মনে হচ্ছে? আমাদের খুঁজতে চেষ্টা করবে নাকি ওরা?'

কিনো বলল, 'চেষ্টা তো করবে। পেলেই মুক্তা কেড়ে নেবে।'

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, ব্যবসায়ীরা ঠিক বলেছিল। হয়তো সত্যি কোনো দাম নেই মুক্তাটার। সব আমাদের চোখের ধাঁধা।'

কিনো জামার আড়াল থেকে মুক্তা বার করে চোখের সামনে ধরল। সূর্যের আলো খেলা করছে তাতে। সে-জৌলুশে কিনোর চোখে জ্বালা করে ওঠে। 'উঁহুঁ। মুক্তাটা আসলেই দামি। নইলে চুরি করার জন্যে ওই শালারা অমন পাগল হয়ে উঠত না।'

অনেকক্ষণ ধরে মুক্তার পিঠে নিজের চোখের প্রতিবিম্ব দেখল কিনো। তারপর বলল, 'এটা বিক্রি করার পর সবার আগে একটা রাইফেল কিনব। তারপর কোনো একটা বড় গির্জায় গিয়ে বিয়েটা সারব। আমাদের ছেলে লেখাপড়া শিখবে।'

কিনো হঠাৎ দেখতে পায়, মুক্তার পিঠ থেকে সব ছায়া, সব ছবি সরে গিয়ে ভাসছে কয়োটিটোর ছবি—জ্বরে পাণ্ডুবর্ণ, শীর্ণ।

মুক্তাটা তাড়াতাড়ি জামার আড়ালে লুকিয়ে রাখল কিনো। মুক্তার পুরনো গান ওর কানে ভুতুড়ে সুরের মতো বাজছে, তার সঙ্গে মিশে গেছে অমঙ্গল সংগীত।

সূর্য আরও উপরে উঠেছে। প্রখর রোদের জ্বালা থেকে বাঁচার জন্য কিনো আর জুয়ানা সরে এল গাছের ছায়ার নিচে। শরীরটা ঢিলা করে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে কিনো। হ্যাট দিয়ে ভালো করে ঢেকে নেয় মুখটা। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

জুয়ানার ঘুম এল না আর। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল শান্তচোখে। কিনোর প্রচণ্ড থাপড়ে মুখের যেখানটায় কেটে গিয়েছিল, সে-জায়গা এখনও ফুলে আছে। মাছি ভনভন করে উড়ে বেড়াচ্ছে আশপাশে। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরীর মতো বসে রইল জুয়ানা।

কয়োটিটোর ঘুম ভেঙে গেছে। হাত-পা ছুড়ে খেলা করছে, হাসি দিয়ে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে সে। জুয়ানা তার দিকে তাকাতেই খিলখিল করে হেসে উঠল। মাটি থেকে একটুকরো ঘাস তুলে ওর গায়ে সুড়সুড়ি দিল জুয়ানা। বোচকার মধ্য থেকে ভাঁড় বার করে পানি খাওয়াল।

কিনো স্বপ্নের মধ্যে নড়ে ওঠে। গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসে গলা থেকে। হাত-পায়ের ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে লড়াই, আত্মরক্ষার চিহ্ন। ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ সে উঠে বসে। চোখ বিস্ফারিত। নাকের ছিদ্র ফুলে ওঠে অনেকখানি। কান পেতে কী যেন শুনতে চেষ্টা করে।

জুয়ানা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'শ্‌শ্‌!'

'আরে দূর! স্বপ্ন দেখেছ।'

'হতে পারে।' কিন্তু অস্থির দেখাচ্ছে তাকে।

রুটি বার করে দিল জুয়ানা। খেতে খেতে হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে কিনো কান খাড়া করে।

জুয়ানা জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'কী জানি!'

আবার কিছু একটা শুনতে চেষ্টা করল কিনো। তার চোখ জ্বলছে জানোয়ারের চোখের মতো। ছুরি বার করে হাতের তালুতে ধার পরীক্ষা করে নেয় সে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। ঝোপের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় রাস্তার দিকে। কাঁটার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে তাকিয়ে থাকে রাস্তার যেদিক দিয়ে ওরা এসেছে, সেদিকে।

তখনই ওদের দেখতে পেল সে। শরীর টানটান হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে মাটিতে শোয়ানো গাছের ডালের আড়াল থেকে তাকিয়ে থাকল। চোখে পড়ল তিনজন মানুষ। দুজন আসছে পায়ে হেঁটে, একজন ঘোড়ার পিঠে। কিনো চিনতে পেরেছে, ওরা কারা। মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্পষ্ট হল সব। ওরা পেশাদার ট্রেলার। কিনোর পায়ের দাগ খুঁজছে। অনুসরণ করছে কিনোকে। শিলাময় পাহাড়ের পথে ভেড়ার পায়ের দাগ ধরে ধরে খুঁজে বার করে ফেলতে পারে ট্রেলাররা। শিকারি কুকুরের মতোই অব্যর্থ লক্ষ্য। ঘোড়ার পিঠে বসা লোকটা কালো রঙের। তার নাক চাদরে মোড়া। লাগামের পাশে রাইফেল চকচক করছে সূর্যের আলোয়।

গাছের গুঁড়ির মতোই স্থির হয়ে বসে রইল কিনো। নিশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল রাস্তার সেই জায়গার দিকে, যেখানে সে পায়ের দাগ মুছে ফেলেছিল। মুছে ফেলারও দাগ থেকে যায় অনেক সময়, যা দেখে ট্রেলাররা অনেককিছু বুঝতে পারে। এইসব দেহাতি শিকারিদের বিলক্ষণ চেনে কিনো। তাদের দেশে পেশার বড় অভাব। শিকার করেই খেতে হয় অনেককে। আজ কিনো ওই লোকগুলোর শিকার। ঘোড়সওয়ার চুপচাপ অপেক্ষা করছে। ট্রেলার দুজন একটা চিহ্ন খুঁজে পেয়ে শুরু করেছে গবেষণা। শিকারি পশুর মতোই আশপাশে শুঁকে ফিরছে।

হঠাৎ আবিষ্কারের উল্লাসে ট্রেইলের কুকুরের মতোই নেচে উঠল লোক দুজন। কিনো ধীরে ধীরে ছুরি বার করে বাগিয়ে ধরে প্রস্তুত হল। কী করতে হবে, ওর জানা

আছে। ট্রেলাররা যদি মুছে দেওয়া জায়গাটা খুঁজে পায়, কিনো লাফ দিয়ে উঠে পড়বে ঘোড়ার উপর। ঘোড়সওয়ারকে কাবু করে কেড়ে নেবে রাইফেল। আর কোনো উপায় নেই, একটাই পথ খোলা আছে সামনে।

রাস্তা ধরে এগিয়ে এল তিনজন। গোঁড়ালির উপর ভর দিয়ে তৈরি হল কিনো, যেন নিঃশব্দে লাফিয়ে উঠতে পারে ঘোড়ার পিঠে। গাছের ডালের আড়াল থেকে রাস্তার সবকিছু ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, এই হচ্ছে সমস্যা।

গোপন জায়গাটায় বসে জুয়ানা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। কয়োটিটো শব্দ করে উঠতেই ওকে কোলে তুলে চাদরে ঢেকে নিল, মুখে গুঁজে দিল স্তন। শব্দ বন্ধ হল।

লোকগুলো কাছে এগিয়ে এল। গাছের আড়াল থেকে কিনো শুধু তাদের পা দেখতে পায়, আর দেখে ঘোড়ার পা। সরু সরু, কালো পা লোকগুলোর। তাদের পরনে সাদা কাপড়। যে-জায়গাটায় দাগ মুছে দিয়েছিল কিনো, সেখানে দাঁড়াল তারা। পরীক্ষা করল জায়গাটা তীক্ষ্ণচোখে। ঘোড়সওয়ারও থামল। ঘোড়াটা মাথা উঁচু করে চিঁহিঁহিঁ করে উঠল। কালো চামড়ার ট্রেলাররা ফিরে তাকাল ঘোড়ার দিকে। তার কান পরীক্ষা করল।

কিনো নিশ্বাস প্রায় বন্ধ রেখেছে। তার কোমর বেঁকে গেছে খানিকটা, হাত আর পায়ের পেশি হয়ে উঠেছে লোহার মতো শক্ত। ঠোঁটের উপরের অংশে ঘাম জমেছে, ট্র্যাকাররা একটু সামনে এগিয়ে গেল, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্রুত তাকাতে লাগল চারদিকে। বুঝতে পেরেছে, আর সামনে এগিয়ে কাজ নেই। কিনো জানে, এবার ওরা কী করবে। ফিরে আসবে। তন্নতন্ন করে খুঁজবে এখানকার সব জায়গা। কিনোর গোপন আস্তানা খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে, এখানে ওদের অবস্থানের চিহ্ন ঢেকে দেওয়ার কোনো উপায় নেই। অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। এখন শুধু একটাই উপায়—য পলায়তি সব জীবতি। পালাতে হবে। নিঃশব্দে গর্তটার কাছে ছুটে এল কিনো। প্রশ্নমাখা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জুয়ানা।

কিনো বলল, 'ট্রেলাররা এসে গেছে। উঠে এসো'!

অসহায় লাগছে নিজেকে। কিনোর মুখে বেদনার রঙ ছড়িয়ে পড়ে। 'ভাবছি ওদের হাতে ধরা দেব।'

মুহূর্তের মধ্যে জুয়ানা উঠে দাঁড়াল। হাত রাখল কিনোর কাঁধে। 'পাগল হয়েছ নাকি? তোমার কাছে মুক্তা। ওরা তোমাকে জ্যান্ত রাখবে, ভেবেছ?'

জামার আড়ালে মুক্তার উপর হাত বোলায় কিনো। দুর্বলস্বরে বলে, 'ওরা তো পেয়ে যাবে।'

জুয়ানা বলল, 'চলো তো—'

কিনো সাড়া দিল না। জুয়ানা ডুকরে কেঁদে উঠল। 'তুমি ধরা দিলে আমি রেহাই পাব? এই বাচ্চা রেহাই পাবে?'

নারীর অশ্রুজল কিনোর মুখভাব বদলে দেয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় সে। 'তা হলে চলো, পাহাড়ের ওপাশে পালাই। ওখানে হয়তো আমাদের খুঁজে পাবে না ওরা। চলো।'

মালপত্র যা ছিল, ছোঁ মেরে তুলে নিল কিনো। ছুটল পশ্চিমদিকে, শিলাময় পাহাড়ের দিকে। ঘন ঝোপঝাড় সরাতে লাগল দুহাতে, জুয়ানার জন্যে পথ তৈরি করে দিতে দিতে এগোল তাড়াতাড়ি। প্রচণ্ড আতঙ্ক ওদের তাড়া করছে। পথের উপর থেকে পায়ের চিহ্ন গোপন করার চেষ্টা করল না কিনো। প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। মাটি তেতে আগুন হয়েছে। ঘন সবুজ গাছগুলো পর্যন্ত মিইয়ে গেছে। কিন্তু সামনে তো আরও খারাপ অবস্থা। সেখানে নগ্ন পাষাণ পার্বত্যপথ। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়—একশিলা স্তম্ভের মতো। তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের মতো ছুটছে কিনো, যতটা উঁচুতে পারা যায়, উঠবে।

আশপাশে পানির চিহ্ন নেই। ক্যাকটাস আর দীর্ঘশিকড়ওয়ালা নলগাছ ছাড়া তেমন কোনো উদ্ভিদ হয় না এদিকটায়। পায়ের নিচে নরম মাটি কিংবা ঘাসের বদলে শক্ত, অকরুণ পাথর। ছোট নুড়ি, বড় চাঁই। পানি নেই কোথাও। শিংওয়ালা ব্যাঙগুলো অবাকচোখে ওই পলায়মান সংসারটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর মাথা ঘুরিয়ে নেয়। কখনও কখনও পাথরের ছায়ার আড়ালে পাহাড়ি খরগোশের ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্তমুখে আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করে তারা। কিনো আর তার বউ ছুটতে থাকে মরুভূমির মতো অকরুণ তাপ পায়ে দলে। সামনে, দূরে পাহাড়ের চূড়াটাকে মনে হয় শীতল, যেন ওদের স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে।

এইভাবে পালাল কিনো। সে জানে, তারপর কী হবে। ট্রেলাররা যখন বুঝতে পারবে, আর এগোনোর দরকার নেই, ফিরে আসবে আগের জায়গায়। কিনো যে-গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা খুঁজে বার করবে। তারপর বাকি কাজটা ওদের সহজ হয়ে যাবে। এই যে নুড়িগুলো সরে যাচ্ছে, দুমড়ে যাচ্ছে ঝরা পাতা, ঝোপের ডালপালা ভাঙছে, আর ওই-যে একবার পা পিছলে গেল—থেকে গেল তার দাগ। কিনো বেশ কল্পনা করতে পারছে ওই কালো মানুষগুলোকে। পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে আসছে আগ্রহে, অবহেলায়। পেছনে ঘোড়সওয়ার, তার হাতে রাইফেল। তার কাজ হবে সবার শেষে, কারণ ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না সে। আহা, আবার কিনোর মাথায় প্রবল রোষে বেজে ওঠে অশুভ সংগীত। টগবগ করে ওঠে অকল্যাণের সুর। সাপের হিস্‌হিস্ শব্দের মতো ঝংকার ওঠে, তার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করে হৃৎপিণ্ডের উদ্দাম ধুকপুকুনি।

পথ খাড়া হয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। কিছুটা উঠে বড় একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে লুকাল ওরা। জুয়ানা পানির বোতল গুঁজে দেয় কয়োটিটোর ঠোঁটে। একটা সান্ত্বনা : এতক্ষণে অনেক পিছিয়ে পড়েছে ট্রেলাররা। কিনো আবছা দিগন্তে দৃষ্টি মেলে দেয়। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিনো বউয়ের হাঁটুর কাছটা লক্ষ করে। ঝোপের শুকনো ডালপালা আর শক্ত পাথরের আঘাতে

অনেক জায়গায় কেটে গেছে। জুয়ানা তাড়াতাড়ি স্কার্ট টেনে হাঁটু ঢাকার চেষ্টা করল। কয়োটিটো লোভীর মতো পানি খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছে। জুয়ানা পানির বোতল বাড়িয়ে ধরে কিনোর দিকে। কিনো মাথা নেড়ে জুয়ানার দিকে তাকায়। বিষম ক্লান্তমুখে শুধু তার চোখজোড়া প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে। কিনো জিভ দিয়ে ফাটাফুটা ঠোঁট চেটে নেয়।

'জুয়ানা, তুই এখানে লুকিয়ে থাক্। আমি এগিয়ে যাই। আমি ওদের পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাব। যখন দেখবি, এই জায়গা পার হয়ে দূরে চলে গেছে ওরা, তখন তুই বেরিয়ে পড়বি। লোরেটো কিংবা সান্তা রোসালিয়া—যেখানে পারিস, চলে যাবি। আমি যদি ওদের কাটাতে পারি, তোর কাছে চলে যাব। এই হচ্ছে এখন সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।'

একমুহূর্ত কিনোর দিকে পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল জুয়ানা। বলল, 'তা হবে না। আমরা তোমার সঙ্গে যাব।'

কিনো রুক্ষস্বরে বলল, 'একা গেলে আমি অনেক তাড়াতাড়ি যেতে পারব, বুঝতে পারছিস না কেন? তুই যদি সঙ্গে থাকিস, বাচ্চাটার বিপদ বাড়বে।'

জুয়ানা বলল, 'না।'

'না বললেই হল? এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় নেই। আমি যা চাই তা-ই হবে।'

জুয়ানা বলল, 'না।'

জুয়ানার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল কিনো। কিন্তু সেখানে না দেখা গেল ভয়, না দ্বিধা, না কোনো দুর্বলতা। জ্বলজ্বল করছে চোখ। কিনো হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। জুয়ানার আর কে আছে ও ছাড়া? আবার শুরু হল পথচলা। তবে এবার আর আগের মতো তাড়া-খাওয়া প্রাণীর মতো নয়।

পথ আর আশপাশের পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এখানকার পাথরের চাঁইগুলো প্রকাণ্ড। বিরাট শিলাখণ্ডগুলোর মাঝখানে গভীর খাদ। ধুলোবালি কিংবা গাছপালা নেই। এমন পথে পায়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। তবু কিনো সোজাপথে না-গিয়ে এঁকেবেঁকে, ঘুরপথে এগোতে লাগল। অনুসরণকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য নানান জায়গায় চিহ্ন রাখল উলটোপালটা করে। আরও খাড়া হল পথ। উঠতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল কিনো আর জুয়ানা।

সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমে। রাতের আশ্রয় খুঁজতে শুরু করে কিনো। শ্যামল গাছগাছালি চোখে পড়ে না। পানি ফুরিয়ে গেছে। রাত কাটাতে হলে পানি চাই। কিনো ঠিক করল, ফাটল ধরে এগিয়ে যাবে। ফাটলের শেষপ্রান্তে পাওয়া যাবে পানি। ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। কারণ প্রতিপক্ষ ওই সুযোগ নেবে। তারাও জানে, ওদের পানি দরকার হবে। কিন্তু এছাড়া উপায়ই-বা কী! প্রাণপণে ফাটল বরাবর উপরে উঠতে শুরু করল কিনো আর জুয়ানা।

ধূসর পাহাড়ের অনেক উঁচুতে অগভীর পুকুর। শিলাখণ্ডের ফাঁক থেকে তিরতির করে উঠে আসে পানি। শীতকালে এইসব শিলাখণ্ডের আড়ালে জমে-থাকা বরফ

গ্রীষ্মকালে একটু একটু করে গলে পানির ধারা তৈরি করে। কখনও কখনও একেবারে ফুরিয়ে যায় উৎস। নিচে শুকনো শৈবাল দেখেই তা বোঝা যায়। কিন্তু যেটুকু পানি পাওয়া যায়, তা বড় মিষ্টি, পরিষ্কার, ঠাণ্ডা। দূর থেকে প্রাণীকুল আসে ওই পানির লোভে। বুনো ভেড়া, হরিণ, বনবিড়াল, ভল্লুক আসে। পানি খেতে আসে নিশাচর পাখি। আশপাশে শিকড় মেলে দেবার সুযোগ পেয়ে গজিয়ে উঠেছে কিছু বুনো আঙুর, কুল আর হিবিশকাস গাছ। লম্বা লম্বা ঘাস, চোখে পড়ে। পানির নিচে চরে বেড়ায় ব্যাঙ, ছোট ছোট মাছ আর জলপতঙ্গ। পানি যাদের প্রিয়, মাইলের পর মাইল পথ পেরিয়ে তারা এখানে আসে। বিড়াল আসে শিকার মুখে নিয়ে। তাদের দাঁতের ফাঁকে রক্ত লেগে থাকে, পশম ছড়িয়ে চুকচুক করে পানি খায়। পানি আছে বলেই এইসব জায়গায় জীবন আছে, পানির জন্যে আবার মৃত্যুও আছে—খুনখারাবি আছে।

সূর্য হারিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। অতিকষ্টে ধুঁকতে ধুঁকতে চূড়ায় উঠে পানির নাগাল পেল কিনো আর জুয়ানা। এখান থেকে দেখা যায় রোদে-পোড়া মরুভূমির পারে অনেক দূরের নীল সমুদ্র। হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা জলাশয়ের ওপর। জুয়ানা সবার আগে অঞ্জলি ভরে পানি তুলে কয়োটিটোর মুখ ধুইয়ে দিল। তারপর বোতল ভরে পানি খাওয়াল তাকে। বিষম ক্লান্ত দেখাচ্ছে বাচ্চাটাকে। মৃদু কান্না জুড়ল সে। যতক্ষণ-না মুখে স্তন গুঁজে দিল, ততক্ষণ আর থামাথামি নেই। দুধ খেয়ে অবশ্য খুশি হল বাচ্চাটা। মুখ দিয়ে অনর্গল শব্দ করতে লাগল। কিনো একটানা অনেক পানি খেয়ে তেষ্টা মেটাল। তারপর হাত-পা ছেড়ে শুয়ে পড়ল পুকুরের ধারে। চেয়ে চেয়ে বাচ্চাকে জুয়ানার দুধ-খাওয়ানো দেখল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল ধাপের শেষপ্রান্তে। দেখতে চেষ্টা করল অনুসরণকারীরা কতটুকু এগিয়েছে। দূরের এক জায়গায় আটকে গেল দৃষ্টি। শরীর আবার শক্ত হয়ে উঠল। আসছে তারা। দুজন ট্রেলারকে দেখাচ্ছে দুটো ছোট পিঁপড়ার মতো। তাদের পিছনে একটু বড় পিঁপড়া। পিছন থেকে কিনোর আঁটো-হয়ে আসা পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলল জুয়ানা।

শান্ত স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কত দূরে।'

কিনো বলল, 'সন্ধে নাগাদ এখানে পৌঁছে যাবে। আমাদের পশ্চিমদিকে সরে যেতে হবে।' তার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে ফাটলের পেছনে পাথরের শোলডার। এর ত্রিশ ফুট উপরে কিনো দেখতে পেল ছোট ছোট গুহার সারি, পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে তৈরি হয়েছিল। পায়ের চপ্পল খুলে উঁচুনিচু পাথর আঁকড়ে কোনোরকমে উঠে পড়ল সে। সবচেয়ে বড় গুহার ভিতর ঢুকে দেখল, ভিতরে বেশ খানিকটা ফাঁক আছে। অনায়াসে লুকিয়ে থাকা চলে। গুহার পাশে দাঁড়িয়েও দেখা যাবে না ভিতরে কেউ আছে কি না। জুয়ানার কাছে ফিরে এল সে।

'উপরে ওঠো। ওখানে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

জুয়ানা কোনো প্রশ্ন করল না। পানির বোতল ভরে নিল। কিনো তাকে সাহায্য করল উপরে উঠতে। তারপর কিনো একে একে উপরে তুলে দিল থলি আর

বোঁচকা। জুয়ানা লক্ষ করে, কিনো পুকুরের ধারের বালিতে ওদের পায়ের যেসব দাগ পড়েছে, সেগুলো মোছার চেষ্টা করছে না। বরং অন্য একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠছে সে নতুন চিহ্ন তৈরি করে। পাহাড়ের গায়ের গাছগুলোর ডাল ছিঁড়ছে। আঙুরগাছ থেকে কয়েক গোছা আঙুরও পেড়ে নিয়েছে। তারপর সাবধানে, কোনো চিহ্ন না রেখে ফিরে এল জুয়ানার কাছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল গুহার ভিতর।

'ওরা এসে ওইদিক দিয়ে উপরে উঠবে, এগিয়ে যাবে সামনে। তখন আমরা উল্টো রাস্তা ধরব, বুঝলি? নেমে যাব সমতলে। একটাই ভয়, বাচ্চাটা না কেঁদে ওঠে। খবরদার! লক্ষ রাখবি, ও যেন একটুও না-কাঁদে।'

জুয়ানা কয়োটিটোকে বুকে টেনে নেয়। তাকিয়ে থাকে তার চোখের দিকে। 'না, কাঁদবে না। ও সব বুঝতে পারছে।' হাতদুটো আড়াআড়ি করে রেখেছে চিবুকের নিচে। তাকিয়ে থাকল দূরের সমভূমির দিকে। পাহাড়ের নীল ছায়া এগিয়ে যাচ্ছে খড়ের মাঠ পেরিয়ে—সমুদ্রের দিকে। গোধূলির ম্লান অন্ধকার নামছে মাটির বুকে। অনুসরণকারীরা এসে পৌঁছল অনেক দেরিতে। সম্ভবত কিনোর ফেলে-আসা চিহ্ন খুঁজে বার করতে বেশ ভুগতে হয়েছে তাদের। ঘোড়াটা সঙ্গে নেই। এতটা খাড়া পথে ঘোড়া চলতে পারে না। ঘোড়াটা কোথাও রেখে এসেছে তারা। উপর থেকে কিনো সব দেখতে পাচ্ছে। তাদের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে তিনটে বিদঘুটে আকারের জিনিস। কিনোর নতুন চিহ্নগুলো খুঁজে বার করল তারা। তবে আবার রওনা হবার আগে খানিক বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিল। পানি খেল। অন্ধকার নেমে আসে চারদিকে। রাইফেলধারী লোকটা বসে পড়ল। অন্য দুজন তার কাছেই উবু হয়ে বসে। সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে। অন্ধকারে তাদের সিগারেটের আগুনের জ্বলা-নেভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর তারা খেতে বসল। অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেল কিনো।

অন্ধকার গাঢ় হল আরও। যেসব প্রাণী পানি খেতে আসছিল, মানুষের সাড়া পেয়ে সরে পড়ল তারা।

কিনো তার পেছনে চাপাস্বর শুনতে পায়। জুয়ানা ফিসফিস করে ওঠে, 'কয়োটিটো!' তাকে শান্ত হবার জন্য অনুনয় করছে সে। কিনো শুনতে পেল, বাচ্চাটা ফোঁপাচ্ছে। জুয়ানা চাদরে আটকে ধরেছে তার মুখ।

নিচে, পুকুরের পাড়ে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল। একঝলক আলোয় কিনো দেখতে পেল, তাদের দুজন ঘুমোচ্ছে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে। তৃতীয়জন পাহারা দিচ্ছে। তার পাশে রাইফেল ঝলসে উঠল হঠাৎ আলোয়। আলোটা নিভে গেল। কিন্তু দৃশ্যটা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে কিনোর মনে।

কিনো প্রবেশপথ থেকে পিছিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এল জুয়ানার কাছে। অন্ধকারে শুধু জুয়ানার চোখদুটো জ্বলছে ঝিকমিক করে। দূর আকাশের একটি তারার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কিনো তার চিবুকের কাছে মুখ রাখল।

বলল, 'একটা সুযোগ আছে—'

'কিন্তু ওরা তো তোমাকে মেরে ফেলবে।'

কিনো বলল, 'রাইফেলআলাকে যদি প্রথমেই পাকড়াও করতে পারি, তো কেল্লা ফতে। তাকেই প্রথমে কাবু করব। অন্য দুজন ঘুমোচ্ছে।'

চাদরের ভিতর থেকে হাত বার করে জুয়ানা কিনোর হাত আঁকড়ে ধরল। 'তারার অল্প অল্প আলো আছে না? ওরা তোমার সাদা কাপড় দেখে ফেলবে।'

'না। চাঁদ উঠবে একটু পরেই। তার আগেই কাজ সারতে হবে।'

একটা কোমল কথা খুঁজে সারা হল কিনো। তারপর বাদ দিল সে-চেষ্টা। বলল, 'যদি ওরা মেরে ফেলে আমাকে... চুপচাপ শুয়ে থাকবি এখানে। শব্দ করবি না একদম। যখন ওরা চলে যাবে, তুই সোজা লোরেটোর দিকে রওনা হবি।'

কিনোর কবজি ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল জুয়ানা।

কিনো বলল, 'অন্য কোনো উপায় নেই রে। এই একটাই উপায় আছে। সকাল বেলায় ওরা ঠিকই আমাদের দেখে ফেলবে।'

কাঁপা কাঁপা গলায় জুয়ানা বলল, 'খোদা হাফেজ।'

কিনোর মুখ আরও এগিয়ে এল জুয়ানার মুখের কাছে। জুয়ানার টানাটানা দুটো চোখের ভিতর তার দৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কয়োটিটোর শরীর খুঁজে পেল সে। তার মাথায় হাত রাখল সে। জুয়ানা কান্নায় ভেঙে পড়ার আগে সামলে নিল নিজেকে।

আকাশের বিপরীতে কিনোর শরীর দেখতে পায় জুয়ানা। প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে সে সাদা কাপড় খুলে ফেলছে। যদিও কাপড়গুলো নোংরা আর ছেঁড়া, তবু ভয় আছে, ওগুলো চোখে পড়ে যাবে। তার চেয়ে কিনোর শরীরের বাদামি ত্বক ঢের নিরাপদ। কিনো ছুরিটা গলায় ঝুলিয়ে নিল তাবিজের সুতোর সঙ্গে বেঁধে, চেয়ে চেয়ে দেখল জুয়ানা। হাতদুটো খালি রেখেছে কিনো। জুয়ানা ভেবেছিল, আরও একবার কাছে আসবে সে। কিন্তু কিনো আর এল না। গুহামুখে তার শরীরটা উবু হল, তারপর মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

জুয়ানা প্রবেশমুখের কাছে এগিয়ে আসে। ছোট গর্তে পেঁচার মতো উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে মানুষটাকে। বাচ্চাটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। পিঠে তার তপ্ত শ্বাস অনুভব করে জুয়ানা। একই সঙ্গে বিপদভঞ্জন মন্ত্র আর দোয়া পড়তে শুরু করে। কালো কালো, অশুভ সেইসব আত্মার হাত থেকে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে চায় সে।

বাইরে তাকিয়ে জুয়ানার মনে হল, রাতটা খুব বেশি অন্ধকার নয়। পুবের আকাশে আলোর আভাস ফুটে উঠেছে। চাঁদ ওঠার দেরি নেই। নিচে তাকাল সে। সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে।

পাহাড়ের গায়ে শোলডারগুলো আঁকড়ে ধরে টিকটিকির মতো নিচে নামতে লাগল কিনো। সাবধানে এগুতে হচ্ছে তাকে। হাত-পা ফস্কে যাতে পড়ে না-যায়, সেজন্য বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরছে পাথুরে পাহাড়ের গা। একটি পাথরের টুকরো খসে নিচে পড়লে কিংবা গাছগাছালির সঙ্গে ঘষাঘষির শব্দ পেলে জেগে

উঠবে নিচের লোকগুলো। কিন্তু কিনোর ভাগ্য ভালো। পরিবেশ নিস্তব্ধ নয়, চারদিকে অনেক শব্দ হচ্ছে। পুকুরের আশপাশে গাছের কোটরে পাখিদের মতো কিচিরমিচির করছে গেছো ব্যাঙ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধাতব ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে ঘুর্ঘুরে পোকা ডাকছে। কিনোর নিজের মাথায় শোরগোল তুলেছে শত্রুর সংগীত। সে-সুর ছাপিয়ে উঠে আসছে সংসারের গান। ঘুর্ঘুরে পোকার ঐকতান তার সঙ্গে মিলিত হল বাজনার মতো। শত্রুর সংগীত ম্লান হয়ে আসছে। সংগ্রামের গান তাকে ঠেলে দিচ্ছে কালো রঙের ওই শত্রুগুলোর কাছে। জিততে হবে তাকে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ছায়ার মতো নেমে এল কিনো। তিল তিল করে পা দিয়ে পাথর আঁকড়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সে। মুখ হাঁ করে রেখেছে, যাতে নিশ্বাসের শব্দও শোনা না-যায়। সে জানে, একটু শব্দ হলেই ওরা দেখে ফেলবে তাকে। এতটুকু সন্দেহের উদ্রেক ঘটানো চলবে না। অনেকটা সময় লাগল নামতে। আর মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে তার শত্রুরা। অন্ধকারে ওদের অবস্থান আর আশপাশের জায়গা—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিনো মনে করতে চেষ্টা করল, ওদের ঠিক কাছেই পাথরের কোনো ফাটল আছে কি না। সমস্ত শরীর ঘেমে ভিজে উঠেছে। বুকের ভিতর মাদল বাজাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। একটানা টেনশনে ওর মাংসপেশি লাফিয়ে উঠছে কোনো কোনো জায়গায়। পুবের দিকে তাকাল কিনো। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চাঁদ উঠবে। আলো ছড়িয়ে পড়বে। তার আগেই হানতে হবে আঘাত। সময় বেশি নেই। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। পাহারাদার লোকটাকে আক্রমণ করবে সে। তাবিজের সুতো খুলে নিয়ে ছুরিটা বাগিয়ে ধরল হাতে।

দেরি হয়ে গেছে। সে তৈরি হবার আগেই চাঁদ উঠল পুবের আকাশে। ত্বরিত গতিতে পাশের ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ল কিনো।

কৃষ্ণপক্ষের শেষদিকের চাঁদ—শীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রখর তার আলো। জোছনা আর গাঢ় কালো ছায়া পাশাপাশি; রহস্যময় করে তুলেছে পাহাড়ি এলাকা। এবার তিন শত্রুর অবস্থান ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে কিনো। রাইফেলওয়ালা চাঁদের দিকে তাকাল। সিগারেট ধরাল আবার। জায়গাটা আরও আলোকিত হয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্যে। অন্য দুজন শুয়ে আছে আগের মতোই। আর দেরি করা চলে না। কিনো সিদ্ধান্ত নিল, এরপর লোকটা যেই মুখ ঘোরাবে, অমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। পাকানো স্প্রিং-এর মতো শক্ত হয়ে উঠল তার পা।

এমন সময় উপরের গুহা থেকে সংক্ষিপ্ত আর্তনাদ ভেসে আসে। পাহারাদার মাথা ঘুরিয়ে শুনতে চেষ্টা করে, তারপর উঠে দাঁড়ায়। যারা ঘুমিয়ে ছিল, তাদের একজন নড়ে ওঠে মাটির উপর। ঘুম ছুটে যায় তার চোখ থেকে। শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার?'

'জানি না। কান্নার মতো মনে হল। একদম মানুষের মতো... বলা চলে বাচ্চার মতো।'

ঘুম-জড়ানো স্বরে লোকটা বলল, 'ভুল শুনেছ। নেকড়ের বাচ্চা। আমি অনেক নেকড়ের বাচ্চার কান্না শুনেছি। একদম মানুষের বাচ্চার মতো কাঁদে।'

কিনোর কপাল থেকে দরদরিয়ে ঘাম নামল। ঢুকে পড়ল চোখের ভিতর। জ্বালা করছে চোখে। আবার চিৎকার ভেসে এল। লোকগুলো সন্দিগ্ধচোখে তাকাল উপরের অন্ধকার গুহার দিকে।

'নেকড়েই হবে।' বলে সশব্দে রাইফেলের ঘোড়া টানল পাহারাদার। কিনো সে-শব্দ শুনতে পেল।

রাইফেল উঁচু করে পাহারাদার বলল, 'যদি নেকড়ে হয়, এতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

বিদ্যুদ্বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিনো। তার আগেই গুলি ছুটে গেছে গুহার দিকে। নলের মুখে আগুনের ঝলক তার মুখে বিচিত্র নকশা তৈরি করেছে মুহূর্তের জন্য। বড় ছুরিটা শূন্যে দুলে উঠল, তারপর সশব্দে আমূল বিদ্ধ হল পাহারাদারের বুকে, কাঁধে। কিনো তখন যন্ত্র হয়ে গেছে। ক্ষিপ্রবেগে ওঠানামা করছে তার শরীর। ছুরিটা তুলে নেওয়ার আগে রাইফেল ছিনিয়ে নিল কিনো। চরকির মতো পাক খেয়ে নিচে বসা লোকটার মাথায় বাড়ি দিল। তরমুজের মতো ফেটে গেল মাথাটা। তৃতীয় লোকটা ঘুমের মধ্যেই চ্যাপটা হয়ে গেল কাঁকড়ার মতো, কিছু বোঝার আগেই তার দেহ ভেসে গেল পুকুরের পানিতে।

তারপর যেন সংবিৎ ফিরে পায় কিনো। ঝড়ের বেগে উঠতে শুরু করে গুহায়। কয়েক মুহূর্তেই বুঝতে পারে, তার হাত-পা জড়িয়ে গেছে বুনো আঙুরের লতায়। ছাড়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। রাইফেল তাক করে শত্রুর দিকে। প্রথম গুলিটা ছোড়ার পরেই দেখতে পায় শত্রু ডিগবাজি খেয়ে পড়েছে পানিতে। সাঁতার কেটে পালানোর চেষ্টা করেছিল লোকটা। কিনো আবার রাইফেল তুলল। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে লোকটার চোখ। কিনো সেই চোখ লক্ষ্য করে গুলি করল।

তারপর বোধশূন্য অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। কী যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে। কী একটা সংকেত ওর মাথায় ঢুকতে গিয়েও বাধা পাচ্ছে। গেছো ব্যাঙ আর ঘুর্ঘুরে পোকারা তখন নীরব।

হঠাৎ কিনোর মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। একটা শব্দ ওর কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। গুহার ভিতর থেকে আসছে সেই শব্দ। তীব্র, তীক্ষ্ণ গোঙানির শব্দ। ক্রমবর্ধমান বিকারের কান্না। মৃত্যুর কান্না।

লা পাজের সব মানুষের মনে আছে, কীভাবে ফিরে এল সেই পরিবার। খুব বেশি বয়সের কেউ কেউ হয়তো ওই ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু বাবা, এমনকি দাদার কাছ থেকে শুনেও যেন সবাই নিজের চোখে দেখতে পায় ওই ঘটনা। মনে করতে পারে সব। এ এমনই এক ঘটনা যা কোনো-না-কোনোভাবে সবার জীবনেই ঘটেছে।

সেই সোনালি বিকেলে শহরের ছোট ছেলেমেয়েরা পাগলের মতো দৌড়াতে শুরু করে। খবর ছড়িয়ে দেয়, কিনো আর জুয়ানা ফিরে আসছে। সবাই ছুটতে থাকে ওদের দেখার জন্য। সূর্য তখন পশ্চিমের পাহাড়ের পেছনে হেলে পড়েছে। পাহাড়ের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে মাটিতে। ঠিক ওইরকম ছায়া ঘনিয়েছে সেইসব মানুষদের মনে, যারা ওদের দিকে তাকিয়েছে।

গর্তওয়ালা গ্রাম্য রাস্তা ছেড়ে শহরে ঢুকল ওরা দুজন। এক সারিতে নয়, পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। কিনো একটু আগে, জুয়ানা পিছে। তাদের পিছনে সূর্য। দীর্ঘ ছায়া পড়েছে ওদের সামনে। মনে হচ্ছে, দীর্ঘ ছায়ার ভার টেনে আনছে ওরা। কিনোর কাঁধে আড়াআড়ি করে বসানো রাইফেল। জুয়ানার কাঁধে চাদর ঝুলছে ঝোলার মতো। তার ভিতরে একটি ছোট, ভারী বোঝা। শুকনো রক্তের ছোপ লেগে আছে চাদরে। হাঁটার সময় অল্প অল্প দুলছে সেটা। জুয়ানার মুখ শক্ত, সুচালো, ক্লান্তিতে মুষড়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে ক্লান্তি তাড়ানোর জন্য স্থির, শান্তশ্রী ফুটে উঠেছে। টানাটানা চোখগুলো তার নিজের দিকেই ফেরানো। বিষম একা মনে হচ্ছে তাকে, ঈশ্বরের মতো একা। কিনোর ঠোঁটগুলো শীর্ণ, চিবুক শক্ত। তার মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেল সবাই। ওর ভয় আসলে ঘূর্ণিঝড়ের মতোই ভয়ংকর। লোকে বলে, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল ওরা মানুষের অতিরিক্ত কোনো জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছে। ওরা এসেছে অনেক বেদনার সাগর পার হয়ে, পৌঁছে গেছে অশ্রুসায়রের অপর পারে। তাদের ঘিরে আছে না-জানা মন্ত্র। যারা তাদের দেখবার জন্য ভিড় জমিয়েছিল, তারা পিছিয়ে দাঁড়াল। কেউ কোনো কথা বলল না।

কিনো আর জুয়ানা শহর পার হল নির্বিকারভাবে, যেন কেউ নেই আশপাশে। তাদের দৃষ্টি ডানে নয়, বাঁয়ে নয়। নিচে নয়, উপরে নয়। তারা শুধু সামনে তাকিয়ে আছে। টলতে টলতে হাঁটছে তারা, যেন কাঠের পুতুল। তাদের সঙ্গে চলে কালো আতঙ্কের দীর্ঘ স্তম্ভ। তারা যখন বাজারের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল, ব্যবসায়ীরা জানালা সামান্য ফাঁকা করে তাকাল তাদের দিকে। ভৃত্যরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। ছোট ছেলেমেয়েদের জামা ধরে ঘরের ভিতর টেনে নিল মায়েরা। ইটের পাঁজর, লোহার খাঁচার পথ পাশাপাশি হেঁটে পার হল কিনো আর জুয়ানা। পৌঁছে গেল তাদের কুঁড়েঘরগুলোর কাছে। প্রতিবেশীরা ভিড় করে দাঁড়াল, পথ ছেড়ে দিল। ওদের বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছিল জুয়ান টমাস। কিন্তু তার বদলে শূন্যে নামিয়ে রাখল হাত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

কিনোর কানের ভিতর উদ্দাম কান্নার মতো সংসারের গান বেজে ওঠে। প্রবল আক্রোশে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবার ইচ্ছা জাগে। তাদের ঘরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। তারা ফিরে তাকায় না। পথের বাধা সরিয়ে হেঁটে যায় বালুচরের দিকে। কূলের কাছে কিনোর ভাঙা নৌকাটা যেখানে পড়ে আছে, সেদিকেও তাকায় না তার।

জলের কিনারায় পৌঁছে তারা দৃষ্টি মেলে দূর সমুদ্রের দিকে। কিনো রাইফেল নামিয়ে রাখে। কাপড়ের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বার করে আনে মহামূল্য মুক্তা। ভালো

করে দ্যাখো। ধূসর, ঘেয়ে মতন দেখাচ্ছে মুক্তাটাকে। তার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে শয়তানের মুখ। হঠাৎ সেখানে আগুন জ্বলে উঠে। হঠাৎ মনে হয়, সেই পুকুরে পলায়নরত লোকটাই যেন তাকিয়ে আছে সেখানে। আর তার ভিতর কিনো দেখতে পায় কয়োটিটোকে—পাহাড়ের গুহায় শুয়ে আছে বাচ্চাটা। পাহারাদারের গুলিতে তার মাথা উড়ে গেছে। কুৎসিত দেখাচ্ছে মুক্তাটা। ধূসর হয়ে আসছে, পচে যাচ্ছে ভিতরটা। খ্যাপা, বিকৃত সুরে মুক্তার গান বাজতে শুরু করে ওর কানে। মুক্তাটা বউয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরল কিনো। জুয়ানা চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। ছোট, ভারী বোঝাটা তার কাঁধে ঝুলছে। মুক্তার দিকে একপলক তাকাল সে। তারপর কিনোর চোখের দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বলল, 'না, তুমি।'

হাতটা পিছনের দিকে টেনে ধরল কিনো সব শক্তি ব্যয় করে। দেখতে পেল, অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করতে করতে ছুটে যাচ্ছে মহামূল্য মুক্তা। দূরে জলের বুকে ঝপাৎ শব্দ হল। তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল জায়গাটার দিকে।

স্নিগ্ধ সবুজ জলের ভিতর দিয়ে তলিয়ে গেল মুক্তাটা। শৈবালের শাখা দুলে দুলে জড়িয়ে ধরল তাকে। তার পিঠের উপর নামতে লাগল মোহময় সবুজ আলো। মুক্তাটা থিতু হল ফার্নগাছের ভিড়ে, বালির উপর। সমুদ্রের উপরে পানিকে মনে হচ্ছে সবুজ আয়না। তার নিচে পড়ে আছে মহামূল্য মুক্তা। একটি কাঁকড়া এগিয়ে আসে, বালি তুলে ঢেকে দেয় মুক্তাটা। কাঁকড়া সরে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায় মুক্তা।

কিনোর কানে ঝাপসা হয়ে আসে মুক্তার গান, মৃদু ফিসফিসানির মতো মনে হয়, তারপর নীরব হয়ে যায় সব।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র